নব্য তুর্কী : সভ্য গ্রীস

কুমারেশ ঘোষ

গ্রন্থ-গৃহ
৬, বংকিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক
দক্ষিণারঞ্জন বসু
পরম প্রীতিভাজনেষু

তুর্কী ও গ্রীস—দুটি দেশকেই ডিঙিয়ে আমরা অন্য দেশ দেখতে যাই। ভ্রমণ তালিকায় দুটি দেশেরই নাম যায় বাদ—অথচ আজকের নব্য তুর্কীকে দেখবার এবং বোঝবার আমাদের বড় প্রয়োজন। তাছাড়া ঐশ্বর্যে গরীব কিন্তু ঐতিহ্যে গরবী, ভাস্কর্যে ভাস্বর—সভ্য গ্রীস আজও আমাদের দ্রষ্টব্য। এমন দুটি দেশের কথা নিয়েই এই বইখানি। 'নব্য তুর্কী : সভ্য গ্রীস'-এর রাজনৈতিক রথের চাকার আঁকা-বাঁকা ক্ষিপ্র গতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আজ প্রায় অসম্ভব। কাজেই সে অপচেষ্টা না করে তুর্কী-গ্রীকদের ঘরোয়া কাহিনী আর দুই দেশে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতাই এই বইখানির মালমশলা। কারণ আমরা, সাধারণ মানুষরা জঙ্গী বোমা-বন্দুকের ঘটনার চাইতে ঘরের হাতা-খুন্তির গল্প পেলেই বেশি খুশি।

তুর্কী, 'যুগান্তরে' প্রকাশিত। গ্রীস 'যষ্টি-মধু'তে।

লেখকের অন্য বই :

উপন্যাস ।। পণ্যা, ভাঙাগড়া, সাগর-নগর, বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস (ছায়াচিত্রে রূপায়িত)
গল্প ।। কাঁকিস্থান, কাঠের ঘোড়া
কবিতা ।। কটাক্ষ, নতুন মিছিল, (সম্পাদনা) সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা, সেকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা
অনুবাদ ।। সালোম, ভ্যাগাবণ্ডস, পংকিল, থেলমা, বেনহুর
নাটক ।। চক্র, ম্যানিয়া, ফ্যাশন ট্রেনিং স্কুল, যম
রম্যরচনা ।। যদি গদি পাই, স্বামী পালন পদ্ধতি
ভ্রমণকাহিনী ।। ইংরেজের দেশে
প্রবন্ধ ।। ওগো মেয়ে সাবধান

নব্য তুর্কী ঃ
সভ্য গ্রীস

আজও মনে আছে, কুষ্টিয়ায় মামাবাড়িতে দোতলার বারান্দায় ঝোলানো থাকতো একটা যুদ্ধের ছবি। ছবিতে কতকগুলি সৈনিক, মাথায় লাল ফেজ পরা, তাতে বাঁকা-চাঁদের চিহ্ন, ছুঁচলো গোঁফ, গোলাপী রং গায়ের, খাপ-ছাড়া তলোয়ার হাতে আক্রমণ করচে তাদের শত্রুপক্ষকে ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে। বাদামী রংয়ের ঘাড় বেঁকানো তেজী ঘোড়াগুলো ল্যাজ তুলে সামনের পা উঁচিয়ে রয়েচে পরম বিক্রমে। একটা ঘোড়ার পায়ের কাছে প'ড়ে আছে মুমূর্ষ এক শত্রু-সৈনিক, আর একজন করচে যন্ত্রনায় আর্তনাদ। লড়াইয়ের সেই বীভৎস ছবিখানি আমার কাঁচামনে এমন পাকা দাগ কেটেছিল যে আজও ভুলতে পারিনি। মাকে জিগ্যেস্ করেছিলাম, ওরা কারা যুদ্ধ করচে ? জবাব পেয়েছিলাম, তুর্কী ওরা, দেখচো না চাঁদ আঁকা মাথায় লাল ফেজ। ভারি সাহসী ওরা।

সেই থেকে তুর্কীদের উপরে কেমন যেন একটা ভক্তির ভাব পোষণ করতাম মনে। হঁ্যা, একটা লড়িয়ে জাত বটে! তারপর কানে এসেচে 'তুর্কী-লাফ' আর 'তুর্কী-নাচন' — ছুটিই অস্বাভাবিক আশ্চর্যের বিষয়, এবং সেই সঙ্গে বাড়তি মজা 'টার্কি-ফাউল' এর আস্বাদ (অবশ্য এ অধম সে রসে বঞ্চিত)। 'টার্কিশ বাথ' সাবানও মেখেচি বহুৎ। অতএব তুর্কীদের বিষয়ে আরো চার ডিগ্রী শ্রদ্ধার পারা উপর দিকেই উঠে যাবার কথা। তারপর কিছুদিন তুর্কীর কথা ভুলে গেছলাম, নিজেই ছাত্রাবস্থার তুর্কী-নাচনে ব্যস্ত ছিলাম। সে নাচনের প্রথমাংশ মানে স্কুলের নাচন যখন প্রায় শেষ ক'রে এনেচি, তখন কাগজে কাগজে খবর পাওয়া গেল, তুর্কীদের নাকি নাচাচ্চে এক নতুন লোক—কামাল পাশা, তুর্কীর দামাল ছেলে। আর সে নাচে তুর্কীরা নাকি খুশি, তাই

তাকে আদর ক'রে ডাকতে শুরু করেচে 'আতাতুর্ক' -- তুর্কী-পিতা। তারপর আমার নাচনের শেষাংশটুকু শেষ ক'রে যখন সংসারের তুর্কী-নাচনে সবে তাল দেওয়া শিখচি, তখন শোনা গেল, তুর্কীদের নতুন নাচের মাষ্টার সবাইকে আধুনিক কালের নতুন নাচের তালে তালে পা ফেলা শিখিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেচেন জন্মের মত। উনিশশো আটতিরিশের নভেম্বরের কথা।

এর বছর খানেক পরেই সারা পৃথিবীতে প্রলয়-নাচন শুরু হ'লো। দেখা গেল, তুর্কীরা আগের যুদ্ধে যাদের হ'য়ে লড়াই করেছিল, এবার তাদের বিপক্ষে। বল্-ডান্সে পার্টনার বদলায় জানি, তুর্কীও তার প্রলয় নাচে পার্টনার বদলালো দেখলাম। কেন? সে অনেক কথা, পলিটিক্স। ওসব আমার মাথায় ঢোকে না ভাল, আর ঢুকলেও থাকে না বেশিক্ষণ। সব চেয়ে বড় কথা, তুর্কী দেখার সখ ছিল, দেখেচি। এবং যা দেখেচি, তাই বরং শোনাই শোন।

অদ্ভুত তুর্কীর অবস্থিতি : পূব-পশ্চিমের দু'নৌকোয় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখান দিয়ে ব'য়ে চলেচে বস্‌ফরাস্ প্রণালী : কৃষ্ণ আর মধ্য-সাগরের হ্যাণ্ড-শেক। তুর্কীর আন্‌কোরা নতুন রাজধানী আন্‌কারা বস্‌ফরাসের পূব তীরে এসিয়ায়, আর তার পুরাণো সহর নাম-করা ইস্তাম্বুল, প্রণালীর পশ্চিমে, ইয়োরোপে। সহরটার সেকেলে নাম ছিল কনস্টান্টিনোপল, যে নাম ঠিক টাইম মত ভুগোলের ক্লাসে মনে আসেনি ব'লে আমাদের বয়সী অনেকেই বেঞ্চে দাঁড়িয়েচে সন্দেহ নেই। আজকাল্ স্কুলে এ ধরণের শাস্তির বরাদ্দ নেই ছাত্রদের এবং তুর্কীর এই সহরের হালফ্যাসানের নামটির সঙ্গে আমাদের দেশী তাম্বুলের ভারি মিল থাকায়, এখনকার ছেলেরা তুর্কী ইস্তাম্বুলের কথা ভোলে না সহজে, কাজেই মাষ্টারমশায় ভুগোল ক্লাসে জিগ্যেস করলে চট্ করে উঠে ফট্ করে ঠিক উত্তরটি দিয়ে আবার বসে বেঞ্চে।

ভূগোলে তুরস্কের অবস্থিতিটা বেশ নতুন রকমের। তার এক পা

পূবে, আর এক পা পশ্চিম ঘাটে, মাথার উপরে রাশিয়ার কমিউনিজ্‌ম-এর রশি। পূব পায়ের কাছে সিরিয়া, ইরাক, ইরান — তিন মুস্‌লিম রাজ্য। তিন লক্ষ বর্গমাইলের দেশটায় লোক কিন্তু বেশি নেই, মাত্তর দু'লক্ষ। অথচ দেশটায় সব আছে। ফল-ফলানো নরম মাটি, ভয়-পাওয়ানো পাথুরে মাটি, ঢালা জায়গা, পাহাড়ে জায়গা, অনেকগুলি বন্দর, অনেকগুলি বড় ছোট মাঝারি সহর। রাজধানী আনকারা, ভারত-বর্ষের দিল্লী আর কি। নতুন সহর, দেশের হর্তা-কর্তাদের বাস। চওড়া রাস্তা, বড় বড় বাড়ি, বিরাট মোটর গাড়ি—সব দেখলে মনে হয় বনেদী পরিবারের এক বিলেত-ঘোরা ছেলে। ইস্তাম্বুল কিন্তু কর্তার ব্যবসার গদীতে বসা বাধ্য ছেলেটি; লোককে বশ করতে জানে, তাই রাজ্যের লোক ওখানে। সরু গলি আর মাঝারি রাস্তা — অথচ মোটরে গিজ্‌-গিজ্‌ করচে, তার মধ্যে একানি-ট্রামও চলেচে ঠং ঠং ক'রে। মাঝে মাঝে পার্ক, দোকান বাজারের হৈ চৈ, ছুঁচলো মীনারওলা সেকেলে সব মস্‌জিদ আর পথে একালের হালফ্যাসানের মেয়ে-পুরুষ। মস্‌জিদের আশে পাশে আচকান পরা, ফেজ মাথায়, নুরওলা মুসলমানদেরই মানায় ভালো, হ্যাট্‌-কোট-প্যান্ট পরা ও গাউন পরা পুরুষ মেয়েদের নামাজ পড়া দেখলে খট্‌কা লাগে না? তুরস্কে এ দৃশ্য আক্‌ছার।

তুরস্কের আবহাওয়াও বড় গোলমেলে। রাশিয়া থেকে উত্তুরে হাওয়া এসে দেশের মাথায় কন্‌কনে শীত ধরিয়ে দেয় শীতকালে। নীচের দিকে আরব মরুর হাল্‌কা হাওয়া এসে পা-টা পুড়িয়ে দেবার যোগাড়। আবার মধ্যসাগরের আরামের হাওয়া পাওয়া যায় দেশটার মধ্যাংশে। চারদিকের আবহাওয়ার ঐ সব কাণ্ড দেখে উপরের বৃষ্টি বলে, আমি আর বেশি নামবো না ও দেশে। অতএব মালুম হচ্চে বোধহয়, দেশটায় শীতকালে দারুণ ঠাণ্ডা, আর গরম কালে ভীষণ গরম। কাজেই তুর্কী-পরিবারের পোষাক খরচটা ভাববার বিষয়। শীত ঠেকাবার জন্যে যত রকমের ধোকড়া পোষাক আছে সংসারে, তা

সবই প্রায় কিনে চাপাতে হয় দেহে আর শীতের হাওয়ার পালা শেষ হ'লে আসেন যখন হাল্কা হাওয়া, তখন সে সব পোষাক খুলে ফেলে অঙ্গে দিতে হয় হাল্কা জামা — না দিতে পারলে আরো ভালো। তবে রক্ষে, এ ব্যবস্থা শুধু সহুরে বাবুদের জন্যে। মাঠের চাষী 'হামাল'রা বা সৈনিকরা পরোয়া করে না এই আবহাওয়ার চোখ-রাঙানিকে। যার মোটা পোষাক আছে বা যার পাতলা পোষাক আছে সে তাই প'রেই কাটিয়ে দেয় শীত গরম, বছরের পর বছর। কাজেই মাঠে যদি দেখো কোনো হালাম চাষ করচে কাঠফাটা রোদ্দুরে তার ধোকড়া পোষাক প'রে বা জমে যাওয়া শীতে তার পাতলা জামা প'রে—হাঁ হ'য়ে যাবার কোন কারণ নেই। ওটা অভ্যাস।

আগে ধারণা ছিল, তুর্কী মানেই ছ'ফুট লম্বা, মাথায় ফেজ লাগিয়ে আরো ছ'ইঞ্চি উঁচু, গোলাপী রং, চাড়া দেওয়া গোঁফ — কিন্তু গিয়ে দেখি, ও হরি, এ যে জগা-খিচুড়ির ব্যাপার! ছ'ফুটি তুর্কী আছে বটে, কিন্তু পাঁচ ফুটিও তো বহুৎ। গায়ের চামড়া বেশির ভাগই গোলাপী বটে, কিন্তু বাদামীও তো আছে। নীল চোখও আছে, কালো চোখও আছে। কেঠো মুখও আছে—মিষ্টি মুখও আছে। তবে মেয়েদের রূপ! আহা হা, বুঝি তুলনা নেই তার! অরসিকেরও কবিতা লিখতে ইচ্ছে করবে। পরে না বটে আগেকার সেই সিল্ক সালোয়ার পায়জামা, নেই বটে তার মাথায় রঙীন হাওয়ায় ওড়া ওড়না, লোটায় না আর সাপের মত লম্বা বেণী বুকের 'পরে, পরে না আর কাজল তার কাজল-কালো চোখে, হাতে রঙীন সিরাজী নিয়ে আসে না আর ডাকলে কাছে, কিন্তু হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, গাউন পরা, বব্ করা চুল, জুতো পরা তুর্কী মেয়ে — খট্-খটিয়ে যাবে যখন পাশ কাটিয়ে,

দোহাই তোমার, চেয়ে দেখো একটু নজর ক'রে।
তাতেই ব্যস্, দেখবে তোমার মাথাই গেচে ঘুরে।
প্রাণটা তখন তুর্কী-নাচন হয়তো দেবে জুড়ে।

আরে, কেশ-বেশ বদলালে কি হবে, রূপের রেশ তুর্কী-তরুণীর মুখখানিতে মাখানো। লাবণ্য টল্ টল্ তার ঢল ঢলে মুখে। টিকালো নাক, রসালো ঠোঁট, আর বাঁকা ভুরুর তলায় থাকা দু'টি কালো-হরিণ চোখ। অর্থাৎ—দেখবে তুমি, সেই কটাক্ষ

আঁখির কোনে দিচ্ছে সাক্ষ্য,
ঠিক যেমনটি ছিল ওদের ঠাকুমাদের কালে।

তুর্কীতে বহুরকম সৌন্দর্য নানা জায়গায় ছড়ানো, কিন্তু তুর্কী-তরুণী হচ্চে সৌন্দর্যের রংয়ের তুরুপ।

যাক্‌গে, ওসব মেয়েদের কথায় কাজ নেই, বরং কাজের কথা বলা যাক। রূপ তো আছেই ঘরে, বাইরে থেকে রূপেয়া আনবার উপায় কি তুর্কীদের, সেটাও দেখা দরকার। পেট ভরা থাকলে তবেই তো বিবি-জান্‌কে 'তুমি আমার পটের ছবি' ব'লে আদর করতে ইচ্ছে যায়। তা তুর্কীরা ব্যবসার তুক্-তাক্ ভাল ক'রেই জানে। তুর্কী মেয়ের মত তুর্কীর মাটিও প্রশংসা পাবার যোগ্য। মাটিতে ফল ফুল তো যথেষ্টই হয়, তা'ছাড়া হয় তামাক, বাদাম, যষ্টি-মধু, তুলো আর ভেড়ার গায়ের লোম। সেইগুলি সময় মত বাইরে পাঠায় আর ঘরে আনে তুর্কী-টাকা —কুরুশ। মাটির জিনিষ বাইরে পাঠিয়েই ওদের টাকা, কলের তৈরি জিনিষ ক'রে বাইরে পাঠাবার যোগ্যতা এখনো হয়নি ওদের, তবে চেষ্টায় আছে। তাই তৈরি মালের জন্যে পশ্চিম আকাশের দিকে মুখ ক'রে থাকতে হয়। তবে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা ওদের আছে অনেক রকমের এবং ক্রমেই তা বাস্তবে পরিণত করচে— খবর পেলাম আর দেখলামও।

বর্তমানে তুর্কীর শাসন গণতান্ত্রিক। মিথ্যে বলা হবে না, যদি বলি নামে গণতান্ত্রিক—আসলে এক-নায়কত্বের ব্যাপার। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয়নি, লাভই হয়েচে দেশের। বরং ক্ষতি হ'ত যদি ঠিক তাল বুঝে

কামাল পাশা নিজের হাতে সব ভারটা না নিতেন। সেজন্যে তাঁকে অস্ত্রের সাহায্যও নিতে হয়েছিল; এবং পাশা বরাবরই বলতেন, আমার মৃত্যুর পর আর এই এক-নায়কত্বের দরকার হবে না। কারণ, তার মধ্যেই আমি দেশটাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে যাবো, নিজেরাই তখন নিজেদের দেশ পরিচালনা করতে পারবে। পাশা তাঁর কথা রাখতে পেরেছেন।

তুর্কী এখন তাই পাশার তৈরি 'পিপ্‌লস্-পার্টি' বা 'গণ-দল'এর সাহায্যে শাসিত। দলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ ক'রে দেশের উন্নতির চেষ্টা করে। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মত, পাশা তাঁর জীবিতকালে একটি 'বিপক্ষ-দল' বা অপোজিসন্ পার্টি খাড়া ক'রেছিলেন—কিন্তু দেখা গেল, তাতে হিতে-বিপরীত হ'লো। বিপক্ষ-দল সরকারের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ঝগড়াঝাটি, মারামারি, শেষে বিদ্রোহ ক'রে বসলো। পাশা বুঝলেন, তুর্কীরা এখনো বুঝতে শেখেনি যে বিপক্ষদলে থেকে সরকারকে দরকার হ'লে সমালোচনা করতে হয়, বিপদে সাহায্য করতে হয়। কাজেই তিনি বিপক্ষদল ভেঙে দিয়ে শাসনের ভার দিলেন 'গণ-দল'কে—১৯৪৫ এর ডিসেম্বরে। আর তিনি হলেন সেই দলের প্রেসিডেণ্ট; তাঁর মৃত্যুতে এখন ইসমেৎ ইনম্নু।

গণদল, সহরে সহরে 'হালকেভি' বা গণ-গৃহ বা 'পিপলস্-হাউস্' এর ব্যবস্থা করলেন। সেখানে নিয়মিত রাজনীতির বিষয়ে আলোচনা, ভাষা-শিক্ষা ও গান-বাজনারও আয়োজন করা হয়। অশিক্ষিতদের পড়াবার ব্যবস্থাও আছে হালকেভিতে। হালকেভির বাড়িগুলি চমৎকার হাল-ফ্যাসানের, তাতে ঐ সব নানারকম অনুষ্ঠানের জন্যে 'হল' আছে, লাইব্রেরি আছে। প্রত্যেক হালকেভিরও একটি ক'রে কর্তা থাকে, তাঁকেও প্রেসিডেণ্ট বলা হয়, এবং সহরের কোন মান্য-গণ্য ব্যক্তিই এই পদটি পান। তবে দেখা গেচে, ডাক্তাররাই এই কাম্য-পদ প্রাপ্ত হন। কেন? তার কারণ বলা শক্ত। হয়তো তুর্কীদের ধারণা, ডাক্তাররা

দেহের রোগ সারাতে যখন পারে—দেহ সর্বস্ব মানুষ চরাতেই বা পারবে না কেন? অতএব প্রেসিডেন্ট-ডাক্তারের তখন সকাল বেলাটা রোগীর জন্যে রেখে সন্ধ্যেটা কাটাতে হয় বয়েজ-ক্লাবে বা মহিলা-সভায় সভাপতিত্ব ক'রে এবং কখনো বা গান বাজনার আসরে ও অভিনয়ের মঞ্চে দাঁরিয়ে বক্তৃতা দিয়ে। এই যেমন অবস্থা আমাদের বাংলা দেশের প্রধান মন্ত্রী রায় মশায়ের!

তুর্কীতে ট্যাক্সের বহর কিন্তু খুব। আর সেই ট্যাক্স দিতে দিতে তুর্কীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ট্যাক্সের বেশির ভাগই যায় সেপাইদের তোয়াজে রাখতে। বিশ বছরের তুর্কীর ঘরে থাকবার উপায় নেই, সেপাইদের তাঁবুতে যেতেই হবে তিন বছরের জন্যে মিলিটারী আদব-কায়দা শিখতে, বন্দুক চালনায় হাত রপ্ত করতে। যে সব তুর্কী যুবক অ-মুসলমান, তাদেরও জন্যে ঐ একই ব্যবস্থা, শুধু বন্দুক তার হাতে তুলে দেওয়া হয় না।

পুলিশী ব্যবস্থাও তুর্কীতে ভালোই। চেহারাগুলিও বেশ লম্বা-চওড়া। পোষাকগুলি জার্মানীর নাজী-অফিসারদের মত, মায় টুপি পর্যন্ত। দেখলে ভয় হয়, ভক্তিও হয়। পথের মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে গাড়ি যাতায়াতের নির্দেশ দেয়। তবে পথের খবর জিগ্যেস্ করে দেখেছি, সবাই ঠিকমত পারে না বাত্‌লে দিতে। শুন্‌লাম, সাদা পোষাকেও নাকি বহু পুলিশ ঘোরাফেরা করে সহরের চারধারে। দেশকে সু-ব্যবস্থায় রাখতে গেলে ঐ গোপন ব্যবস্থাটি যে অপরিহার্য, বোঝা গেল, আধুনিক তুর্কী সরকারের সেটি অজানা নেই।

খবরের কাগজ বহু রকমের দেখা গেল; এবং সেগুলি সচিত্র ও কার্টুন-কন্টকিত; বিশেষ ক'রে 'আমকা বে', 'তম্বুল তেইজী'। তবে সরকারের বিরুদ্ধে এরা লেখে না বড়। আর লিখবেই বা কেন? গণদল সরকার এদের সুখ-সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্য, আত্ম-সম্মান-জ্ঞান, স্বাধীনতা — কী দেয় নি বলো? কাজেই দেশ-বিদেশের খবর আর হাসি-ঠাট্টার

ব্যাপারই থাকে বেশি কাগজে। তাই কার্টুন ছবির ভারি আদর তুর্কীতে। রামুজ আর নাদির খুব নাম করা কার্টুনিষ্ট ওদেশের, আমাদের দেশের কাফি খাঁ বা শংকরের মত, বিলেতের লো বা ষ্ট্রব-এর মত। ছোট ছোট সহরেও নিজস্ব খবরের কাগজ আছে—তবে ঐ একই ধাঁচের। তাছাড়া সরকারের রেডিও আছে, আন্‌কারা আর ইস্তাম্বুল থেকে প্রচার করা হয় নানা খবর, নানা রকমের গান-বাজনা, অভিনয়।

তুর্কীতে একটা ভারি মজার গল্প আছে। তুর্কী খোকা বা খুকু মায়ের কোলে দুদু খেতে-খেতে শুনতে পায় এই গল্প—কাজেই সব তুর্কীর কাছেই এটি একটি প্রিয় গল্প। গল্পটি যাকে নিয়ে, আমাদের কাছেও সে ভদ্রলোকটি অপরিচিত নয়। কাজেই শোনাই গল্পটা :

একদিন বিশ্ব-বিভীষিকা তুর্কী তৈমুর বসে আছেন তাঁর সিংহাসনে, কাছে বসে তাঁর প্রিয় অনুচর নাস্‌রেত্তিন হোকা। তাঁর নির্দেশমত কোন এক দেশের দূত দরবারে এলো এবং তাঁকে সসম্মানে উপহার দিল একটি মুক্তা-খচিত আয়না। এর আগে আয়না কি বস্তু, তৈমুরের তা জানা ছিল না। যখন শুনলেন, ওটিতে নিজের মুখ দেখা যায়, রাজা তে ভারি খুশি এবং আয়নাটি নিজের মুখের সামনে ধরতেই দেখা গেল তাঁর মুখখানি ঝুলে গেচে। শুধু তাই নয়, একটু পরেই দেখা গেল, ডাকাত তৈমুর কাঁদচেন। রাজা কাঁদচেন! কাজেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রিয় অনুচর নাস্‌রেত্তিন হোকাও কাঁদতে শুরু করলেন। দু'জনে অঝোরে খানিকক্ষণ কাঁদবার পর তৈমুর তাঁর কান্না থামালেন। দাড়ির মধ্যে ঘুসে যাওয়া চোখের জল মোছা গেল না, তবে বাকিটুকু সিল্কের রুমালে মুছে হোকাকে বললেন, ওঃ, ঐ বস্তুটিতে নিজের মুখ দেখে আমার কান্না পেয়ে গেছলো। কী কুৎসিত আমি দেখতে! বাপস্‌, তুমিও নিশ্চয়ই কাঁদছিলে আমারই দুঃখে? তবে আমি কান্না থামালাম, অথচ তুমি দেখচি এখনো কেঁদে চলেচো! ব্যাপার কি? শুনে হোকা ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হে রাজামশায়, আপনি তো যতক্ষণ ঐ বস্তুটিতে নিজের মুখ

দেখছিলেন, ততক্ষণই কাঁদছিলেন, কিন্তু আমাকে যে আজীবনই আপনার মুখখানি দেখতে হবে, আমি তাই ভেবেই কাঁদচি।

একথা শুনে তৈমুর হোকার কান্না সঙ্গে সঙ্গে শেষ ক'রে দিয়েছিলেন কিনা গল্পে সে কথা বলেনি আর বলেনি সেই দেশের দূতটির অবস্থা কি হ'লো? দূতটি ভারতবর্ষ থেকে গেছলো কি?

এ ধরণের মজার গল্প তুর্কীদের পেটে বহুৎ জমা করা। আড্ডায় ব'সে এক একটি ছাড়ে আর হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়। ভারি বৈঠকী জাত এই তুর্কী।

বইয়ের দোকানও দেখলাম অনেক। দামও এমন বেশি নয়। তা ছাড়া বিদেশী বইও আছে — তুর্কী-ভাষান্তরিত করা। বিশেষ ক'রে বিদেশী সিনেমার ভাল গল্প পেলে তো কথাই নেই। আতাতুর্ক তো মাত্তর বিশ বছর হ'লো পুরোন তূর্কী ভাষাকে ঢেলে সোজা ক'রে সেজে দিয়েচেন, — তুর্কী-জন যাহে আনন্দে করিবে পান তুর্কী-সুধা বারি। কিন্তু এরই মধ্যে দেশের বহু পুরোন বই আবার ছাপা হয়েচে, হয়েচে নতুন বইয়ের সৃষ্টি। তবে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়নি এখনো। তুর্কীর বীরত্ব আছে, সাহিত্য নেই।

সুপুরুষ তুর্কীদের চোদ্দ-পুরুষের হিসেব দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। তবে যেটুকু কষ্ট ক'রে উদ্ধার করেচি, সেটুকু জানিয়ে নিজের পাণ্ডিত্যটা প্রচার করবার লোভটা আর সামলানো গেল না। তুর্কীদের আদিপুরুষরা এসেছিল ইউফ্রাটিস্ ও টাইগ্রীস্ নদীর ধার থেকে। সেখানে নদীর ধারে একদল সভ্যজাত বাস করতো, জানতো তারা লোহার ব্যবহার। সে প্রায় যীশু জন্মাবার ছ'হাজার বছর আগের কথা। ঐতিহাসিকরা এদের নাম দিয়েচেন 'হিত্তাইত'। এই হিত্তাইতদের একটা দল ঐ নদীর ধার থেকে চলে যায় তুর্কীস্থানে — এখন যেখানে আনকারা, তারই কাছে বোয়াজ-কোয় নামে এক জায়গায় কেন

চলে যায়, তা জিগ্যেস করলে বলতে পারবো না। হয়তো অন্যদলের সঙ্গে মন কষাকষি হ'য়েছিল, বা ঝগড়া-ঝাটি হ'য়েছিল কিংবা গেছলো ভাগ্য অন্বেষণে। কারণ, ঐসব মানসিক বা অর্থ-নৈতিক ব্যাপারগুলো একালের মত সেকালেও ছিল। বোয়াজ-কোয়তে নিজেরা বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে নিলো, আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্রপাতি, সৈন্যসামন্ত, দুর্গ ইত্যাদি সব তৈরি করলো বহুৎ। কিন্তু দেখা গেল, তাদের জ্বালাতন করতে কেউই এলো না। সেই সময় তুর্কীতে এক রাজ-বংশের উদ্ভব হয়েছিল, তাদের বলা হ'তো 'সেলজুক বংশ'। সেলজুক রাজার তাঁবে অত সৈন্য অত অস্ত্রপাতি — কাজেই মেজাজটাও বেশ টন্‌টনে। অতএব দেখলো যখন সেপাইগুলো কেবল হাই তুল্‌চে আর মরচে পড়া তলোয়ারে ঝামা-তেল ঘস্‌চে, তখন একদিন ঠিক ক'রলো রাজ্য জয়ে বেরুনো যাক। দক্ষিণে পায়ের কাছেই রয়েচে মুসলিম রাজ্য, কাজেই পা বাড়ানো গেল ঐ দিকেই। ইতিপূর্বে মহম্মদের কোরাণ প'ড়ে তুর্কীরা নিজেরাই তাঁর চেলা বনেছিল, কিন্তু গুরুভাইদের দিকে খোলা তলোয়ার নিয়ে এগুতে একটুও দ্বিধা করলো না। ধর্ম ঘরের, কিন্তু সাম্রাজ্য বাইরের সম্পদ। কেন, এ যুগে দেখচো না? যীশুখ্রীষ্টের চেলারা কেমন এ-ওর মাথার খুলি উড়িয়ে দিচ্চে! অথচ উনি তো বলে গেচেন, প্রতিবেশীদের ভালবেসো। শুধু তাই নয়, কেউ যদি তোমার এ গালে চড় মারে, তবে ও গালটাও বাড়িয়ে দিয়ো তার দিকে। আর ওদের দেশে যত বাইবেল পড়া হয় আর বিলি করা হয়, তেমনটি আর কোথায় কোন ধর্মপুস্তকের ভাগ্যে জোটে কিনা সন্দেহ। কাজেই মুসলিম তুর্কীরা মুসলিম আরব-রাজ্যের দিকে ধাওয়া ক'রেছিল ব'লে 'হাঁ' হ'য়ে যাবার কোন কারণ নেই। তুর্কী সেনাপতি তুরগুল বে এসিয়া মাইনরের উপর সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কাঁপিয়ে তুললো দেশটাকে। সেটি জয় করবার পর খ্রীষ্টান রাজ্য বাইজানটিয়ানও বাদ গেল না। শেষ পর্যন্ত জেরুজেলাম। বহু লোককে তারা কলমা পড়িয়ে নিজের জাতে তুললো, এমন ধর্ম-

প্রীতিও দেখা গেল বহু জায়গায় । শুধু তাই নয়, খ্রীষ্টানদের তীর্থস্থান জেরুজালেমে খ্রীষ্টানদের 'প্রবেশ নিষেধ' হুকুম-জারী ক'রে দেওয়া হ'লো। কোন জিনিষেরই বেশি বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এ ক্ষেত্রেও হ'ল তাই। ইয়োরোপে খ্রীষ্টানরা গেল ক্ষেপে। তবে রে ! সবাই জোট বেঁধে আক্রমণ ক'রলো মুসলিম দেশকে। সেই থেকে ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে 'ক্রুশেড'-এর পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার প্রায় দু'শো বছর পরে তুর্কীতে দেখা দিল আর এক পরাক্রান্ত রাজা — ওসমান। নিজেকে তিনি ওটোমান তুর্কী নামে জাহির করতেন এবং হুকুম জারি ক'রে দিলেন, এবার থেকে তুর্কী রাজাদের বলা হবে 'সুলতান'। এরপর থেকে সুলতানরা একটানা ছ'শো বছরের উপর তুর্কী-গদীতে বসে গেচেন এবং এই বংশেরই সুলতান— 'সুলেমান দি ম্যাগনিফিসিয়েণ্ট' বা জাঁক-জমকী সুলেমান তুর্কী ইতিহাসের এক মহা-পুরুষ। এঁর সময়ে তুর্কীরা সাম্রাজ্য বাড়িয়েছিল বুদাপেষ্ট থেকে মক্কা পর্যন্ত আর ওদিকে উত্তর মিশর থেকে কৃষ্ণ-সাগর পর্যন্ত। ব্যাপার দেখে খ্রীষ্টান ইয়োরোপ ভয় পেয়ে গেছলো! তুর্কী ইতিহাসের এই পাতাগুলো সোনার জলে লেখা।

এবার তুর্কী-লাফ মেরে, আসা যাক প্রথম মহাযুদ্ধের যবনিকা পতনের পরে । তুর্কী, জার্ম্মানীর হ'য়ে লড়েছিল ইংরেজ-আমেরিকার বিরুদ্ধে। সেই যুদ্ধাঙ্কের শেষ দৃশ্যে দেখা গেল বিজয়-লক্ষ্মী ইঙ্গ-মার্কিনী গলায় মালা পরালেন, যা করেচেন এবারও। কাজেই শত্রুপক্ষের দেশ, তুর্কীদের হাত থেকে বহু দেশ কেড়ে নেওয়া হ'লো, রইলো তাদের ভাগে আনাতোলিয়া মাত্র । অটোমান সাম্রাজ্য নস্যাৎ হ'য়ে গেল। ব্রিটিশ, কনস্টান্টিনোপল হাত করলো; গ্রীকরা স্মার্ণা; ইতালীরা আস্তালিয়া, আর ফরাসীরা সাইলিসিয়া। সবাই দেশটাকে ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে ভাবলো, ওঃ খুব জব্দ করা গেচে তুর্কীদের । কিন্তু ওদিকে

যে একটি লোক আবার দেশ গড়বার কাজে লেগে গেচে — তা তারা দেখেও দেখলো না। লোকটি হচ্চে মুস্তাফা কামাল পাশা। পাশা ছিলেন যুদ্ধের সময়ে এক সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষ। যুদ্ধের শেষে ইংরেজদের হাতের পুতুল সুলতান, পাশাকে হুকুম দিলেন — সৈন্যদের সব ছুটি দিতে। আর কেন? যা হবার তো হ'লোই। কিন্তু পাশা অন্য চাল চাললেন। সৈন্যদের সব জড়ো করলেন আনাতোলিয়ায় এবং কাছেই আনকারা সহরে গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে জানালেন, যে পর্যন্ত না তুর্কী আবার স্বাধীন হচ্চে, আমি এখান থেকে 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'। দেশের ছেলেদেরও নাচিয়ে দিলেন তিনি। শেষে দেখা গেল, তুর্কী মাত্রই তাঁর কথায় উঠচে বসচে। নেতিয়ে-পড়া তুর্কীরা হাতের কাছে একটা নেতা পেয়ে বেঁচে গেল যেন। তা ছাড়া সুলতানের আমলে দেশের লোকেরা ভেড়া ছাগলের মত ব্যবহার পেয়ে এসেচে, এবার নতুন আশা নিয়ে জেগে উঠলো পাশার সঙ্গে।

রণক্লান্ত ইংরেজের দল দেখলো, আরে, এতো মহা ফ্যাসাদ হ'লো! অথচ আবার যে নতুন ক'রে হা-রে-রে-রে ক'রে লড়াইয়ে নামবে, সে উৎসাহও নেই। তা ছাড়া নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে সবাই ব্যস্ত। কাজেই সবাই ঢোক গিলে চেয়ে রইলো পাশার দিকে।

পাশা রব তুললেন, তুর্কী আমাদের, ফেরৎ চাই। কিন্তু কথায় আছে, 'সফরি ফরফরায়তে'। পুঁটি গ্রীস ভেংচে বললে, দাঁড়াও, দিচ্চি ফেরৎ। তেড়ে ে ল পাশার দিকে। পেছনে ইংরেজদল বললে 'বাক আপ্, বাক আপ্'। পাশা ভয় পেলেন না — বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর পাশে দাঁড়ালো তুর্কী ছেলে-বুড়ো সব ই। লড়াই হ'লো পুরো তিনটি সপ্তাহ ধ'রে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থোতা মুখ ভোঁতা ক'রে হঠে আসতে হ'লো গ্রীসকে। সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠলো ঃ কামাল পাশা-কি জয়। এ সব ১৯২২ সালের আগস্টের ঘটনা।

দেশ পাশাকে সম্মান দিলো — গাজী-বিজয়ী। সারা বিশ্বে প্রচার

হ'য়ে গেল তাঁর নাম। আগে সুলতানদের পদবী ছিল — 'সাহানসা' ভূ-বিধাতা, এসিয়া-ইয়োরোপ-আফ্রিকার মালিক, তুই সমুদ্রের অধীশ্বর, আশ্রিতের ভরসা, আল্লার প্রতিবিম্ব ইত্যাদি। এগুলি নেহাৎ হাস্যকর বলে মনে হ'লো তুর্কীদের কাছে। পাশা এই বছরেই 'সুলতানী' উঠিয়ে দিলেন। পরের বছরে ২৯শে অক্টোবরে পাশা গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন দেশে এবং তিনি হলেন তার সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট।

এইবার দেশ গড়ার কাজ। ছেলে খেলার ব্যাপার নয়। দেশটা এত দিন অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে ছিল। শিক্ষা বলতে 'হোক্‌জা'রা কোরাণ-এর কবিতা মুখস্থ করাতো ছেলেদের। কাজেই তুটি সমস্যা দেখা দিল, একটি জন সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া এবং আর একটি শিক্ষা দেবার জন্যে শিক্ষক তৈরি করা। কাজে এগুতে গিয়ে দেখা গেল আর এক বাধা। তুর্কী ভাষা সব আরবি বর্ণমালায় লেখা — সাধারণ লোকদের অক্ষর চিনতে চিনতেই বাজি ভোর হয়ে যায়। কিন্তু পাশা দমলেন না। আরবি বর্ণমালা উঠিয়ে দিয়ে রোমান বর্ণমালার ব্যবস্থা করলেন। শেষ পর্যন্ত নিজে বেরুলেন চক খড়ি হাতে গ্রামে গ্রামে, বোঝাতে লাগলেন গ্রামবাসীদের নতুন বর্ণমালা—বোঝাতে লাগলেন এই নতুন বর্ণমালায় কত সুবিধা শেখবার। পরে নির্দেশ দিলেন সব্বাইকে স্কুলে যেতে হবে এ, বি, সি, ডি পড়তে , লেখাপড়া শিখতে। শুধু তাই নয়, তিনি নিজে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই — যে কোন স্কুলে গিয়ে ক্লাসে পরীক্ষা নিতে লাগলেন, দেখতে লাগলেন, কাজ কতদূর এগিয়েচে। সবাই তটস্থ হয়ে রইল।

তারপর নজর দিলেন তিনি ভাষার উপর। তার কারণ ছিল। অটোমান সুলতানদের আমলে তুর্কী ভাষাটা ছিল আরবি আর ফার্সী ভাষার জগা-খিচুড়ি। তাছাড়া বহু আজে বাজে বাড়তি কথা ছিল যা এযুগে অচল। আনকারায় এক কমিটি বসিয়ে সে সব তিনি

ছাঁটলেন, ভাষায় আনলেন রোমানঅক্ষরে বিশুদ্ধ তুর্কী বুলি।

এবার পাশার কাজ হ'ল দেশের লোকের মন থেকে কুসংস্কার সরানো। এই পরিকল্পনার প্রথম কাজ, লোকের মাথা থেকে বহুপুরোন ফেজ ছাড়ানো। বললেন সবাইকে, ও জিনিষটা এসেচে গ্রীকদের হেলমেট থেকে, ওটি ছাড়তে হবে এবং এবার থেকে পরতে হবে হ্যাট। কথাটা শুনে অনেকেই মৃত্ব মাথা চাড়া দিয়েছিল, কিন্তু শেষে দেখা গেল সবাই মাথা পেতে তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়েচে, মাথায় পরচে হ্যাট। অবশ্য গিয়ে দেখলাম, ওটি বাধ্যবাধকতার মধ্যে নেই। খালি মাথায় অনেক লোক পথে চলাফেরা করচে, যেমন দেখেচি কন্টিনেন্টে এবং গোঁড়া ইংলণ্ডে। ফেজ ছাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পাশা তাঁর দেশবাসী সবাইকে পুরোন আমলের দেশী পোষাক ছাড়িয়ে বললেন কোট প্যাণ্ট পরতে। ফেজই যখন ছাড়তে হ'লো, দেশী পোষাক ছাড়তে আপত্তি করলো না কেউ। তবে গ্রামে চাষীর পরণে আজও দেখা যায় সেই পুরোন দিনের দেশী পোষাক।

এবার ধর্মে আঘাত দিলেন পাশা। বরাবরই পাশার ধারণা ছিল, ধর্মের গোঁড়ামিই হচ্চে, উন্নতির একমাত্র বাধা। তিনি ইসলামকে আর জাতীয় ধর্ম বা ষ্টেট-রিলিজিয়ন ব'লে মানলেন না। বললেন, ধর্ম হচ্চে হাঁড়ির ব্যাপার. সরকারী ব্যাপারে ওর কোন হাত নেই। লোকে সরকারী চাকরি পাবে যোগ্যতা হিসেবে, কোরাণ পড়ে ব'লে নয়। এমনকি দেশের আইন-কানুনও আর ইসলামের নির্দেশানুযায়ী রইলো না, সুইজারল্যাণ্ডের আধুনিক কানুন দেখা দিল তুর্কীতে। এসব করতে পাশাকে বেগ পেতে হয়েছিল। গোঁড়া ইসলামীরা রীতিমত মাথা নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু পাশা তাঁর পেশী-বহুল হাতে তাদের শিং ধ'রে মাথা নাড়া বন্ধ করায় আর নাড়তে সাহস করেনি।

আর একটি বড় কাজ পাশা করেচেন, তাঁর মা-বোনদের মুক্তি দিয়ে। বোরখা-প্রথা উঠিয়ে দেওয়ায় তুর্কী মেয়েরা খোলা হাওয়ায়

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলো পাশাকে। তুর্কী মেয়েদের রূপের স্তুতিগান গাইতে পারতাম না, যদি না পাশা তাদের ঘোমটাগুলি খুলে দিতেন আগে থেকেই। পুরুষদের উপরও নির্দেশ হ'লো, একটি ছাড়া বিবি রাখা চ'লবে না। বহু পুরুষের মুখ ঝুলে গেছলো নিশ্চয়ই, কিন্তু বিবিরা সবাই পাশাকে আবার জানালো আন্তরিক শুভেচ্ছা। তুর্কী মেয়েরা এখন তাদের পাশ্চাত্য বহিনগুলির মতই স্বাধীনা। অনেকেই সরকারী ব্যাপারে লিপ্ত।

এই যে সব ওলোট পালোট ক'রে দেওয়া—এতে সাহস ও শক্তি দু'য়েরই দরকার। ঐ দুটি জিনিষেই তৈরি পাশা হটেননি তাই কোন কাজেই। একটা পেছিয়ে পড়া দেশকে তিনি মাত্তর দশ বারো বছরের মধ্যে জগৎ-সভায় প্রথম বেঞ্চে বসিয়ে দিলেন। দেশের কাছে পাশা আবার একটা নতুন খেতাব পেলেন, আতাতুর্ক—তুর্কী পিতা! বইতে প্রথম ভাগে লেখা হ'লো: কামাল আতাতুর্ক আমাদের জাতীয় পিতা, তিনি ছোটদের স্নেহ করেন, আমরা ছোটরা তাঁকে ভালবাসি। আতাতুর্ক দীর্ঘজীবি হোন।

দেশ নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়েচে দেখে আতাতুর্ক হাসিমুখে বিদায় নিলেন দেশের কাছে, ১৯৩৮ এর ১১ই নভেম্বরে। দেশ কেঁদে ভাসিয়ে দিল। তাদের অশ্রু জমাট হ'য়ে তৈরি হ'লো আতাতুর্কের স্মৃতি-স্তম্ভ — ইস্তাম্বুলে, আনকারায়। পাশার অন্তরঙ্গ কর্মী ইসমেৎ ইনন্নু বসলেন তাঁর ফেলে যাওয়া প্রেসিডেন্টের শূন্য চেয়ারে। দেশ চোখ মুছে আবার কাজে মন দিল।

অটোমান সুলতানদের সময় সম্বোধনের ঘটাঘটি ছিল বহুৎ। গাঁয়ের মোড়লকে এক রকম বলতে হতো, বিচারককে আর এক রকম, অফিসের বড়বাবুকে অন্যরকম, ডাক্তার, ইমাম, হোফজা, এদের জন্যেও যথা

যোগ্য সম্বোধনের ভাষা থাকতো জিয়োনো। আবার তাদেরও অন্য ভাষায় জানাতে হ'তো ঐসব সম্বোধনগুলির স্বীকৃতি। মানে, রীতিমত গুপলেট হ'য়ে যাবার দাখিল হ'তো প্রায়ই। আর এর সম্বোধনটা ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়লে হয় তার মুখ ভারি হ'তো, নয়তো চোখ রাঙিয়ে উঠতো। অর্থাৎ সম্বোধন মুখস্থ করতে এবং সেগুলি পাত্রস্থ করতে রীতিমত 'নরঃ নরৌ নরাঃ' র মত সকালে উঠে ধাতস্থ করতে হ'তো বোধকরি। আতাতুর্ক সেগুলিকে সব ঝেঁটিয়ে বিদায় করেচেন এবং এখন যেসব কথাগুলি আছে তা ছোট্ট, সহজ এবং অল্প।

আজকাল একজন তুর্কীর সঙ্গে দিনে তার পরিচিত কারোর দেখা হ'য়ে গেলে বলবে, গুণেদিন্। মানে, দিনটা তোমার ভালয় যাক। তেমনি সন্ধ্যায় দেখা হ'লে বলবে, তুনেদিন্। ইংরেজীর গুড মর্নিং, গুড ইভ্নিং আর কি! তবে চাষীরা এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আজো সেই পুরোন আরবি সম্বোধনটাই ব্যবহার করেঃ মারহাব্বা। অর্থাৎ স্বাগতম্। যদিও ঠিক আরবি মানে হচ্চে, আরামে ব'সো। তবে আর একটি খুব চলিত শুভেচ্ছা বাণী শোনা যায় প্রায়ই ঃ সবা শের-ইফ্লারিনিজ্ হাইয়ার উলসান্। মানে, তোমার দিন আজ মঙ্গলময় হোক। রাত্রে কথাটি বদলে গিয়ে হবে ঃ গেজিনিজ্ হায়ার উলসান্। আবার তরুণদের মুখে ফরাসী 'বঁ জোয়া' এবং ইংরেজী 'বাই-বাই'-ও শুনেচি। তবে বিদেশী ঐ বুলি-গুলি ছেলে ছোকরাদের মুখেই শোনা যায়, বাপ-খুড়োদের মুখে নয়। ওগুলি বিদেশী সিনেমা-প্রাপ্ত বুলি।

তারপর ধরো, তুমি হয়তো তুর্কী বাড়ীতে নেমন্তন্নে গেছ। তুর্কী-কর্তা তোমাকে দেখেই বলবে, সাফা গেল্দিনিজ্ কিংবা হজ্ গেল্-দিনিজ্। এ দু'টি তুর্কী কথা। মানে, স্বাগতম্। উত্তরে চুপ ক'রে থাকলে অভদ্রতা। তোমাকে বলতে হবে, হজ্ বাল্দাক্। তারপরে তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল, এবার বাড়ি যাবে। স্রেফ কেটে পড়লে চলবে না। বলতে হবে, আল্লাহা ইস্মারলাদিক্। অর্থাৎ ঈশ্বর তোমার মঙ্গল

করুন। তখন কর্তা তোমায় বলবে, 'গুলে-গুলে'। মানে, হাসতে হাসতে বাড়ি যান। অবশ্য কথাটা শুনলে হাসি পাবারই কথা। তাছাড়া এই 'গুলে-গুলে' কথাটি গোলমেলেও বটে। কারণ ওটির আর একটি মানে হচ্চে, তোমার শান্তি হোক।

আবার হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েচে তোমার পথে। দেখলে, বন্ধুর মুখ শুকনো। 'কি হয়েচে রে?' সে বললে তার দুঃখের কথা। তখন তুমি কি বলবে? বলবে, 'গেজ্ মিজ্ উল্সান্'। মানে, যেতে দাও। গ্রামাঞ্চলে 'মাজাল্লা' কথাটিও খুব চলে। অর্থাৎ ভগবানের কি ইচ্ছা, কে জানে! ধরো গ্রামে এক চাষীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েচ। চাষীর খোকা হয়েচে সম্প্রতি। একগাল হেসে খোকাকে নিয়ে এসে দেখালো তোমাকে। অন্য কারোর কুদৃষ্টি যাতে খোকাটির উপর না পড়ে, সেজন্যে বারবার তোমাকে 'মাজাল্লা' কথাটা বলতে হবে এবং তার গায়ে মাঝে মাঝে সামান্য থুতু ছিটোতে হবে। দেখবে, সরল চাষীর প্রাণখোলা হাসি।

সুলতানী আমলে ইসলাম যখন ছিল তুর্কীদের সরকারী ধর্ম, তখন প্রায়ই লেগে থাকতো বারো মাসে তেরো পার্বন। এখন ধর্মের পরব, তথা ছুটিছাটা বহুৎ কমিয়ে দিয়েচে তুর্কী সরকার। এখন যে সব ছুটি-ছাটা হয়, তাকে তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়। এক হচ্চে, দেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনার জন্যে ছুটি; আর একটি হচ্চে, ধর্মগত পরবে ছুটি, যা সরকার মেনে নিয়েচেন এবং তৃতীয়টি হচ্চে ঘরোয়া পরব — অর্থাৎ যে সব তুর্কী এখনও সেই পুরোন আমলের ধর্মগত পরব মানেন। তাঁরা নিজেদের বাড়িতে সেটি পালন ক'রে থাকেন এবং নিজেদের দোকান-পাট যদি থাকে, তা বন্ধ রাখেন।

ধর্মগত পরবের মধ্যে রমজানটাই বড় পরব এবং সরকার এ পরব মেনে নিয়েচেন। আগেকার দিনে খুবই ঘটা ক'রে এই পরব হ'তো এবং পয়সাওলা লোকেদের দ্বার থাকতো অবারিত, গরীবদের জন্যে। আগে সারা মাসটায় যে পয়সা বা 'ফিত্রা' জমা হ'তো, সেটা রমজান

উৎসবের দিনে মসজিদের কর্তাদের হাতে দেওয়া হ'তো কাঙ্গালী ভোজনের জন্যে। এখনও কাগজে কাগজে আবেদন ছাপিয়ে 'ফিত্রা' জমা হয়, তবে খরচ হয় দেশের বিমান-বাহিনীর বা 'হাবা-কুরুমু'র উন্নতিকল্পে। রমজান মাসে দিনের শেষে তোপ দেগে জানানো হয়, উপবাস ভঙ্গের সময় হ'লো আর তখনই চারধারে প'ড়ে যায় হৈ চৈ ব্যাপার। কাফেগুলি ভর্তি হয়ে যায়, ফুটপাথ দিয়ে চলা দায় হয়, সিনেমার সামনে ভিড় বাড়ে। অনেকে উপবাসও করে না, তবে কাফে-সিনেমায় ভিড় করে আর সবাইয়ের মত। রমজান পরব বা 'বেইরাম'-এ সারা মাসটায় মসজিদগুলো সাজানো থাকে নানা রংয়ের আলোয়।

রমজান বেইরামের তিন দিন পরেই শেকের বেইরাম। এ সময় তুর্কীরা ভাল পোষাক পরে, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে দেখা করতে যায়, নানারকম খাবার মিষ্টি দিয়ে আসে তাদের। বাড়ির ঝি-চাকরদের তখন বকশিস্ মেলবার সময়। রমজানের দু'মাস দশদিন পরে হয় কুরবান-বেইরাম। এ সময় ছাগল, ভেড়া—আর ভেড়া না পেলে পুংজাতীয় উট বলি দেওয়া হয়। ভেড়া বলির চলনই বেশি। সহরে ভেড়ার বাজার বসে যায়। দেখবে সবাই প্রায় দড়ি বেঁধে ভেড়া টেনে নিয়ে যাচ্চে কিংবা হামালের ঘাড়ে চড়িয়ে। এক একটি ভেড়ার দাম কিন্তু কম নয়। প্রায় ত্রিশ তুর্কী পাউণ্ড, মানে আমাদের ৬৫৲ টাকা। কাজেই অনেকে চাঁদা ক'রেও ভেড়া কেনে। এই কুরবানী ক'রবার নিয়ম আছে। হাড়কাঠে গলা বাধিয়ে আমরা যেমন 'জয় মা কালী' ব'লে খাঁড়া বসিয়ে দিই—সে রকম চলবে না। এখানে ভেড়ার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে, পরে সামনের ডান পায়ের সঙ্গে পেছনের বাঁ পা-টিও বেঁধে দিতে হবে। তার পর মক্কায় গিয়ে হজ ক'রেচেন এমন কোন ব্যক্তি এসে দেখিয়ে দেবেন যখন কোথায় কোপ বসাতে হবে—তখন বলির ব্যবস্থা। আবার খেয়াল রাখতে হবে রক্ত যেন মাটিতে পড়ে ঠিকমত। এই সময় যদি বৃষ্টি পড়ে, গোঁড়া ইস্লামী বলে, এ বৃষ্টি আল্লা দিয়েচেন পথের রক্ত ধুয়ে ফেলবার

জন্যে। কুরবানী হবার পর, যার ভেড়া সে পায় সিকি ভাগ, — বাকি-টুকু বিতরণ করা হয়। এ সময় থলে কাঁধে ভিক্ষুকরা ঘোরে বাড়ি বাড়ি মাংস পাবার লোভে। কুরবানীর এই মাংসের জন্যে হৈ-হল্লাও কম হয় না। এ সময়তেই কাগজে কাগজে আবেদন বেরোয়, ভেড়ার চামড়া সরকারে জমা দেবার জন্যে, যাতে বিক্রী ক'রে হাবা-কুরুমুর জন্যে টাকার ব্যবস্থা করা যায়। আর, এই শেকের-বেইরামে অনেক তরুণ তাদের প্রণয়িনীর জন্যে ভেড়া উপহার দিয়ে থাকে, ভেড়াটির শিংঙে এবং তুম্বায় মেহেদী রং লাগিয়ে। তাতে বোঝা যায়, হ্যাঁ, প্রণয়ী তার শাঁসালো।

ইস্তাম্বুলে সুলতান আমায়েৎ মস্‌জিদ্, ওসমানিয়া মস্‌জিদ্, সুলেমানিয়া মস্‌জিদ্, আনা সোফিয়া মস্‌জিদ্ (আগে এটি খ্রীষ্টান গির্জা ছিল) ইত্যাদি সাজানো হয় এই সময় নানা রঙের আলো আর ফুলে। রাত্রে ঐ আলোর ছায়া যখন গোল্ডেন হর্ণ ও বস্‌ফরাস্ প্রণালীর নীল জলে প'ড়ে থর থর কাঁপতে থাকে — অতিবড় নাস্তিক তুর্কীরও মন নর্‌মে আসে; বলে, আহা, মরি-মরি! বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাটও দিন হয়ে যায় আলোয় আলোয়।

দেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনার জন্যে যে সব পরব বা বেইরাম হয়, তার মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্চে, সুমহারিয়েত বেইরাম — মানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা-দিবস। প্রতি বছরে ২৯শে অক্টোবরে এই বেইরাম। ঐ দিন প্রতি গৃহে, পথের 'পরে দেখা যায় তুর্কীর জাতীয় পতাকা। অনেক জায়গায় বড় বড় প্লাকার্ডে লেখা আছে: এগোও, নইলে পতন। কোথাও বা লেখা আছে: আমাদের তুলনা আমরাই। প্রায় সব সহরেই বেলা সাড়ে দশটায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে হালকেভির প্রেসিডেণ্ট মশায় একটা কড়া গোছের বড়া বক্তৃতা দিয়ে দেন। মিছিলও বা'র হয়। তাতে জাতীয় পতাকা হাতে ছেলে বুড়ো সবাই থাকে। ব্যাণ্ডের তালে তালে মার্চ ক'রে যাওয়া সুসজ্জিত তুর্কী তরুণ তরুণীদের দর্পময় ভঙ্গী দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নত না হ'য়ে উপায় নেই। 'কী হবে ওসব ক'রে' ব'লে ঘরে

ব'সে থাকে না কেউ। মিছিল এসে থামে আতাতুর্কের স্মৃতি-স্তম্ভের তলায়, দেওয়া হয় পুষ্পাঞ্জলি, পরে তুর্কীর সুগম্ভীর জাতীয় সঙ্গীত কাঁপিয়ে তোলে আকাশ বাতাস।

পরে বিকেলে শুরু হয় স্পোর্টস্, কন্সার্ট, অভিনয়। আন্কারা রেডিয়োয় সারাদিন বাজতে থাকে ব্যাণ্ড। সন্ধ্যায় সাজানো সব কাফেতে ভোজন-পর্ব ও বড় বড় হোটেলে বাড়তি প্রোগ্রাম, বল্-নাচ। মদ্যপান তো আছেই। বিলিতি মদের পাশে দেশী মদের বোতলও স্থান পায়। তুর্কীর আঙুর বা ডুমুর থেকে তৈরি সুরা 'রাকি'র বোতল খোলা হয়, খোলা হয় সিরিয়ার আরক, মিশরের জিবিব। সারা তুর্কী রাত ভোর বিভোর হ'য়ে থাকে আনন্দে। বিলিতি নাচের সঙ্গে সুবিখ্যাত তুর্কী-নাচনও বাদ যায় না। ওকে বলে 'জেবেক' নাচ। দেখলাম, নাচটি বড় সোজা নয় — রীতিমত ব্যালান্সের দরকার। 'জেবেক' নাচটা ইজমীর (আগেকার স্মার্ণা-র) একচেটিয়া জিনিষ। একজন বা অনেকেই নাচতে থাকে আর দর্শকরা তালে তালে দেয় হাত তালি। এ ছাড়াও হাত ধরাধরি ক'রে রুমাল নিয়ে 'লাজ' নাচও দেখবার মত। নাচগুলি অতি অল্প জায়গার মধ্যে হয় আর বাস্তির ঘটাঘটি নেই। আনন্দে মস্গুল তুর্কীরা সেদিন সারা দেশটাকে গুলজার ক'রে রাখে।

নববর্ষের প্রথম দিনটিও তুর্কীর একটি নামকরা বেইরাম, তবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবসের মত অত জাঁক-জমকের নয়। এ ছাড়া ঘরোয়া পরব অনেক আছে, তা নিয়ে যাদের মাথা ঘামাবার, তারাই ঘামায়, সবাই নয়।

কোন দেশে গিয়ে সেখানকার রাজধানীর ঢালাই ফুটপাথে ঘুরে বেড়ালে কিংবা ট্রামে বাসে খানিকটা এদিক-ওদিক ক'রলে—কিছু যে দেখলে না, তা নয়; তবে দেশটাকে যে চিনলে না, এটা ঠিকই। সহরের বড় বড় রাস্তা, ভারি ভারি দোকান, ঠং ঠংয়ে ট্রাম, দোতলা সব বাস, গষ্ট-মটানো লোক, ঠোঁট রাঙানো মেয়ে—ও প্রায় সব দেশেই সমান।

আমাদের এসপ্লানেডেও যা, লণ্ডনের পিকাডিলীতেও তাই আর প্যারীর শাঁ ইলিজেও তথৈবচ। তফাৎ উনিশ-বিশের। কিন্তু সহর থেকে একটু দূরে মাটির পথে পা দিলেই পাবে আসল লোকের, আসল দেশের পরিচয়। সহরে যারা ঘুরে বেড়ায়, ওরা তো সব অভিনেতা-অভিনেত্রী। পুরুষদের মুখোস পরা, মেয়েদের মুখে পেণ্ট করা। মুখে বলে মুখস্থ বুলি, প্রাণের বুলি নয়। কাজেই যেখানেই যাও, মাথা খাও, গাঁয়ে যেয়ো।

তুর্কী আমাদেরই মত চাষীর দেশ। তবে আমরা, ভদ্রলোকেরা যেমন লাঙলের কথা ভাবতেও পারিনে, কিন্তু তুর্কীর পয়সাওলা লোকেরাও জমিজমা রাখে, চাষ-আবাদের খেয়াল রাখে, নিজেদের 'চাষী' ব'লে পরিচয় দিতেও মুখ-চোখ-কান লাল করে না লজ্জায়।

অবশ্য গ্রামের অবস্থা ভাল নয় এখনোও। কাঠের আর পাথরের তৈরি চাষীর জীর্ণ বাড়িগুলো দেখলেই মালুম হয় তার হাঁড়ির খবর। বিশেষ ক'রে আনাতোলিয়ার মাটি এমন পাথুরে যে, চাষীকে যাকে বলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবে ধরিত্রীর কাছ থেকে কিছু আদায় করতে হয়। চাষী-গিন্নিও কর্তার সঙ্গে মাঠে বেরিয়ে লাঙল ঠেলতে শুরু করে, তাই তুর্কী-চাষীর উৎসাহ বোধহয় আরো বাড়ে।

তুর্কী মেয়েরা শুধু চাষে নয়, বাইরের সব কাজেই নাক গলিয়েচে যেমন, তেমনি ঘাড় পাততেও পেছ্-পা হয় নি। তাই আনকারায় আতাতুর্কের স্মৃতিস্তম্ভের একপাশে দেখা যায় কামানের গোলা কাঁধে এক চাষী-রমণীর মর্মর মূর্তি। আতাতুর্ক এত ক'রেচেন, কিন্তু গাঁয়ের চাষী-বুড়ির মাথা থেকে ঘোমটা খুলতে পারেননি। কাজেই, একেলে গাঁয়ের সেকেলে বুড়ির মাথায় সেকেলে বোরখা আজও চাপানো। এমনকি চাষীর বাড়িতে কোন পুরুষ অতিথি এলে তার সামনে আসাও নিষেধ। কফি খানাতেও চাষী-বুড়ি যায় না, তার কর্তার মাথায় একেলে সখ চাপলেও নয়। আর সময়ই বা কৈ ? ঘরে সৃষ্টির কাজ

পড়ে আছে না? গরু-ঘোড়াগুলোর দানা-পানি দিতে হবে; মুরগী-ভেড়াগুলোকে ঘরে তুলতে হবে; নাতি-নাতনীদের দুধ খাওয়াবে কে, তাদের রূপকথার গল্প শুনিয়ে? কাজেই চাষীকে একলাই যেতে হয় কফিখানায় এবং সেখানে আড্ডা জমায় অনেক রাত অবধি।

তুর্কী চাষীরা নতুন লোক বা বিদেশীদের সহজে পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু যদি দেয়, তবে তার জন্যে যেন সব উজাড় ক'রে দিতে পারলে বাঁচে। কী ক'রে তাকে যত্ন করবে, সেই ভাবনাই তখন বেশি তার। খবর যায় গাঁয়ের মোড়ল 'মোহ্‌তার'-এর কাছে, তার উপরেই পড়ে অতিথি সৎকারের ভার। অবশ্য প্রায় সব গাঁয়েই আছে একটি আস্তানা—অতিথি-শালা। সেখানে তাকে আনা হয় এবং সে খবর সঙ্গে সঙ্গে তড়িতবৎ সারা গাঁয়ে রাষ্ট্র হ'য়ে যায়।

সব দেশের মতই তুর্কীতেও মেয়েদের কৌতুহল বেশি। কাজেই নিজেদের মধ্যে শুরু হ'য়ে যায় আলোচনা: কে রে? কেন এসেচে রে? কোথাকার লোক রে? ইত্যাদি। কিন্তু আসল কাজ ভোলে না কেউ। যথারীতি 'মোহ্‌তার'এর নির্দেশমত কোন বাড়ি থেকে আসে অতিথির বিছানাপত্তর, কোন বাড়ি থেকে আসে খাবার, কোন বাড়ি থেকে আসে গরম জল, গামছা, যা দরকার। গাঁয়ে তুর্কীর অতিথি কারো একলার নয়, সারা গাঁয়ের।

তুর্কী গাঁয়ের 'মোহ্‌তার'রা হ'চ্চে এক একটি ক্ষুদে হিটলার। তাদের কথায় গাঁয়ের সবাই ওঠে, বসে। মাইনে পায়না এক পয়সাও, মান কিন্তু খুব। তবে গাঁয়ের কাউকে সার্টিফিকেট দিতে হ'লে কিংবা রেশন খাতায় সহি করলে এবং বিয়ে-থাওয়ার ব্যাপারে, বাঁধা প্রাপ্য আছে কিছু। তা ছাড়া জমির ফসল তো আছেই। তা চলে যায় 'মোহ্‌তার'এর ভালই।

তুর্কী চাষীদের জাতীয় পোষাকগুলি চমৎকার। সহরে আসে যখন,

কোট-প্যাণ্ট প'রে আসে, আর মেয়েরা গাউন। তখন মনে হয় যেন ময়ুর তার পালক খুলে দাঁড়কাকের দলে মিশলো। ঈশপের গল্পের উল্টো ব্যাপার। গাঁয়ে চাষী পুরুষ বা মেয়েরা পরে ঢিলে পায়জামা—শালোয়ার। মেয়েরা গায়ে দেয় রঙীন ব্লাউজ আর পুরুষেরা ঐ ব্লাউজের মতই প্রায় দেখতে 'মিনতান্'। তার উপর কোমরে জড়ায় রঙীন কাপড় কয়েক পাক — ওটি মেয়ে পুরুষের একই সাজ। তবে পুরুষ গোঁজে তাতে একটা ছোরা আর মেয়েরা মাথায় পরে ওড়না। এই ওড়না দেখে চিনতে হয়, মেয়েটি কুমারী, না কারোর ঘরণী। ক'টি ছেলে-মেয়ের মা, তাও চেনা যায় এই ওড়নার রং আর ডিজাইন দেখে। তবে সে সব চেনা তোমার আমার মত বিদেশীর পক্ষে রীতিমত না হোক, একটু শক্ত।

চাষীদের খাওয়াটা কিন্তু খুব খারাপ নয়। আমাদের চাষীদের মত পান্তাভাত, নুন আর মাছ বা শাক-চচ্চড়ি নয়। আটার মোটা রুটি, চীজ, দুধ, দই, ভাত প্রায় সব চাষীর হেঁসেলেই থাকে। পেট ভরবার জিনিষ আছে যেমন ওদের, মন ভরবার জিনিষেরও আর অভাব রাখচে না তুর্কী সরকার। স্কুল আছে সব গাঁয়েই। চাষী নিজেও পড়ে সেখানে, তার ছেলেমেয়েরাও। গাঁয়ে খবরের কাগজ পড়ার খুব উৎসাহ। পুরোন খবরের কাগজ? তাই সই। প্রায় দেখা যায় গাঁয়ের বুড়ো বুড়িরা গোল হ'য়ে ব'সেচে, আর তাদের সামনে কোন স্কুলের ছেলে, হয়তো বা ওদেরই কারো নাতি চেঁচিয়ে প'ড়ে শোনাচ্চে খবরের কাগজ। সহরে এমন অনেক ছেলে দেখেচি, লোকেদের কাছ থেকে পুরোন খবরের কাগজ ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্চে। প্রথম প্রথম মনে হ'তো বুঝি পয়সা চাইচে। আমাদের চোখ পয়সার ভিখিরী দেখতেই অভ্যস্ত, জ্ঞানের ভিখিরী প্রথম দেখলাম তুর্কীতে।

তুর্কী ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা নয়। আনাতোলিয়ায় পাথুরে মাটি তো আছেই আর শীতের সময় উত্তর তুর্কী বরফে ঢেকে যায়। অনেক গরু মারা পড়ে সে সময়; তারপর নেকড়ের উৎপাত। কৃষ্ণ সাগরের আশে

পাশেই তুর্কীর যা কিছু বসতি, যা কিছু সম্পদ। ঐ মাটিতেই ফলে ফল তুলো, তামাক—যা বেচে তুর্কীর পয়সা। আমাদের বাংলার মা-টির মত নরম মাটি তুর্কী নয়। বাংলার আদুরে চাষী বৃষ্টি পড়লে হাড় জির জিরে গরু আর ভাঙা লাঙ্গল নিয়ে দু'চারবার মাটি আঁচড়ে, বীজ ছড়িয়ে দাওয়ায় ব'সে দা'কাটা তামাক টানে — গুড়ুক গুড়ুক। জানে মাটি ফুঁড়ে ধান হবে, পাট হবে। না হয়তো খোদাকে গালাগালি দেবে। তুর্কী চাষা জানে — তাদের শক্ত মা-টি। তাই আপ্রাণ খাটতে হয়, জল টেনে টেনে দিতে হয় চাষে। তাদের মা-টি বলে ঃ খাটো, খাও। তুর্কী চাষী তাই করে।

গাঁ মাত্রেই কয়েকদিনের জন্যে মন্দ লাগে না। ট্রেনে ব'সে আরো ভাল লাগে। সহরে পাখার তলায় ব'সে গাঁয়ের কবিতাও গড়গড় ক'রে লেখা যায়—কিন্তু গাঁয়ে গিয়ে বেশিদিন বাস করতে হ'লেই মেজাজ যায় বিগড়ে। আরে, সেখানে সহরের হৈ হৈ নেই, হল্লা নেই, মজা নেই। ভাল লাগে? আর কথাই তো আছে — man is a social animal. কাজেই গাঁ থেকে চ'লে আসা যাক সহরে। ইস্তাম্বুলে।

তা, ইস্তাম্বুলের বিষয়ে বলবার বহুৎ আছে। মিনার, গম্বুজ উঁচোনো ফালি-সমুদ্রে তেভাগা সহর ইস্তাম্বুল অন্যান্য সহর থেকে একটু আলাদা। লোকও অনেক—প্রায় আট লক্ষ। রাজধানী আনকারাতেও অত নেই। তাছাড়া সহরটার চারধারেই ইতিহাসের পাতা ছড়ানো। সত্যি, বয়সও কম হ'লো না সহরটার। তুর্কীরা ইস্তাম্বুলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, কিন্তু ভক্তি করে আনকারাকে। আনকারায় আমীর ওমরাহের ব্যাপার, প্রাসাদ ছাড়া কথাই নেই! কাজেই দূর থেকে সেলাম ঠুকে স'রে প'ড়তে পারলেই বাঁচে তুর্কী। কিন্তু ইস্তাম্বুল যেন কফিখানার আড্ডা। কফির কাপ হাতে নিয়ে — 'কি ইয়ার কেমন আছো?' ব'লে গল্প জমানো যায় বেশ খানিকক্ষণ। ওঠবার কথা মনেই

থাকে না। তাই ইস্তাম্বুলে যে সব তুর্কীরা একবার গেড়ে বসেচে, তারা আর ওঠবার নাম করেনি। যদি ব'সতেই থাকে শুধু, আর ওঠবার নাম না করে—তা হ'লে যা পরিণতি হয়, তাই হয়েচে ইস্তাম্বুলের। বেড়েই চলেচে বসতি। তেভাগা ইস্তাম্বুলের ভাগগুলি হচ্চে—ইস্তাম্বুল (যেটি আদিম); বেয়োলু (Beyglu — আগে 'পেরা' বলা হ'তো) আর উসকুদার। আমাদের কলকাতায় যেমন উত্তর পাড়ার সঙ্গে দক্ষিণ পাড়ার একটু হালচালের তফাৎ আছে; আবার, যেমন আছে কিছুটা হাওড়ার লোকেদের সঙ্গে—ইস্তাম্বুলের ব্যাপারেও তাই। এক পাড়ার লোকের আর এক পাড়ায় গিয়ে একটু বাধো বাধো ঠেকে। হালচালে মেলে না ঠিক।

আদি ইস্তাম্বুল আর বেয়োলুর মাঝখান দিয়ে ব'য়ে চলেচে নীল জলের ঢেউ—গোল্ডেন হর্ণ। তবে এ ত্বটিকে এক ক'রেচে ত্বটি সেতু ত্ব'জায়গায়।

কিন্তু উস্‌কুদার এই ত্বটি জায়গা থেকে আলাদা হ'য়েচে বসফরাস্‌ প্রণালীটির জন্মে। উস্‌কুদার আমাদের দলে প'ড়েচে—মানে এশিয়ায় এবং আর ত্বটি খণ্ড ইয়োরোপীয়। কাজেই উস্‌কুদারের নেটিপেটি লোক আর বেয়োলু-ইস্তাম্বুলের চটপটে লোক দেখলেই বোঝা যায়, কে কোথাকার আমদানী। বসফরাসের উপর কোন সেতু বাঁধা যায়নি— তাই পারাপারের জন্মে ষ্টিম-লঞ্চ, ষ্টীমার আর নৌকো।

ইস্তাম্বুলে কি নেই ? মিনার সমেত জমকালো মস্‌জিদ্‌, আগেকার খ্রীষ্টানী গির্জা, বিরাট সব অট্টালিকা, ব্যস্ত সমস্ত ডক, সাজানো নানা দোকান-পাট, ফুল ভর্তি বাগিচা, লম্বা-চওড়া সেতু, নীল জলের ঢেউ, উপরে নীল আকাশ, নীচেয় লোকের ভিড়, ট্রাম লাইন বাঁধানো রাস্তা, সরু সরু গলি, বেঞ্চিপাতা কফিখানা, কাঁচ ঘরে বিরাট অফিস — সব পাবে ইস্তাম্বুলে। আর সব সহরের মতই — এখানে ধনী আছে, গরীব আছে, বোকা আছে, চালাক আছে। বহু জাতও আছে। ইংরেজ,

ফরাসী, গ্রীক, আর্মেনিয়ান — হরেক রকম। দেখে চেনা দায়, কথা বলতে গেলেই ধরা পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য, ভারতীয় কাউকেই চোখে পড়লো না একদিনও। আমার মত কালো-ঘেঁসা বাদামী চামড়াও দেখলাম না একটাও। তা হ'লে অন্তত ছুটে গিয়ে জিগ্যেস করতাম, দাদার কোত্থেকে আসা হয়েচে? বাঙ্গালী তো দূরের কথা—মম-বর্ণের কারোর দেখা পেলে বোধহয় মনে হ'তো তাকে আমার পরমাত্মীয়। লাল-গোলাপী দেখে দেখে চোখটা এরই মধ্যে হ'য়ে গেছলো ঘোলাটে; অথচ আমার যাত্রা-পথে রংয়ের খেলার সবে শুরু।

তুর্কীরা দোকান সাজাতে জানে। কোথায় কোন জিনিষটা রাখলে লোকের নজরে পড়বে—তুর্কী-ব্যবসাদারের সেদিকে নজর ঠিক আছে। দোকানের কাঁচগুলো ঝক্‌ঝকে, মেঝে তক্‌তকে পরিস্কার। সৌন্দর্যজ্ঞান নেই তুর্কীর—বলা চলবে না। ফলের দোকানগুলিতে সময়কার ফলে সাজানো। দোকানে দাঁড়ালে বলা যায়, তুর্কীর গাছ-গাছড়ায় এখন কি ফল পাকচে। আর এই ফলগুলোই যেন শীত-গ্রীষ্মকালের বেরোমিটার। অবশ্য, এ ব্যাপারটা সব দেশেই সমান। 'লেউ বোম্বাই আ-উ-ম' ব'লে পশ্চিমা আমওলা হাঁক দেয় যখন কিংবা আমের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বাঙ্গালী মুসলমান আমওলা গলি দিয়ে যখন হাঁক দেয় 'আম নেবেন গো মা-ঠাকরুণ' — কোন বাড়িরই কর্তা বা গিন্নী ভুল করেন না, সেটি শীতকাল ব'লে।

তবে তুর্কীতে একটা চলতি কথা আছে: তরমুজের বীজ জলে পড়লে তবে স্নান করা উচিত। মানেটা আর কিছু নয়, তরমুজ বাজারে উঠলে বোঝা গেল এইবার বেশ গরম পড়েচে— অতএব জল্‌কে চল্‌।

ফলের দোকানের মত ফুলের দোকানও সহরে অনেক। তুর্কীরা ফুল-পাগল। একদিন বেড়াতে বেরিয়ে ধরো উঁচু ইঁটের কালচে প্রাচীরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্চি, ভাবলাম হয়তো কোন কবরখানা

হবে। কিন্তু প্রাচীরের গেটের কাছে এসেই থমকে দাঁড়াতে হ'লো, দেখি বাগান আলো ক'রে ফুল ফুটে আছে নানা জাতের। রেষ্টুরেণ্টের টেবিলেও থাকে ফুলদানিতে সদ্য-ফোটা ফুল। তবু তুর্কী-ফুলের ভাগ্য খারাপ। কারণ তুর্কী-তরুণীর খোঁপায় জড়িয়ে থাকা — ভাগ্যে তার নেই। সে সৌভাগ্য আছে ভারতীয় ফুলের।

ইস্তাম্বুল জেগে ওঠে খুব সকালেই। সকাল সাতটা সাড়ে-সাতটা থেকেই শুরু হ'য়ে যায় বাসে-ট্রামে মেয়ে-পুরুষের ভিড়। ন'টায় অফিস পৌঁছুতে হবে যে! অটোমান সুলতানদের সময় তুর্কীর সব ব্যবসা ছিল গ্রীক, ইহুদীদের হাতে। কারণ তুর্কীর ভদ্রলোকেরা তখন ব্যবসা করাকে নীচু চোখে দেখতো। মোক্ষ লাভ করতো যদি সৈন্যদলে ঢুকতে পেতো কিংবা পেতো সরকারি চাকরি। মরণ আর কি! — আমাদের মতই। তবু ওদের স্বাধীন দেশে সেপাইদলে বা সরকারি চাকরিতে ভর্তি হবার কারণ ছিল, আমাদের তাও ছিল না। আমাদের ঐ ধরণের কিছু করা মানে ছিল বিদেশী সরকারের গোলামী করা। এখন আমাদের সে অবস্থাটা নেই বটে, কিন্তু মোহটা আছে পুরো-মাত্রায়! তবে রক্ষে সরকারি চাকরি বা অন্য ব্যবসায়ী অফিসের চাকরি গাছের ফলের মত বছর বছর ফলে না। তাই নতুন কিছু করবার ধাঁধায় ঘোরে আমাদের তরুণদল।

তুর্কী তরুণরা বহুদিন থেকেই লেগে গেচে ব্যবসায়। ব্যবসায়ে গ্রীক-ইহুদীরা আর পাত্তা পায় না তুর্কীতে। তুর্কীরা আগে বীরত্বই দেখিয়েচে যুদ্ধে, কিন্তু ব্যবসায়ে দূরদৃষ্টি আর রাজনীতিতে কূটদৃষ্টি— দুটি চোখেই যে আছে তুর্কীর, তার প্রমাণ পাওয়া শক্ত নয়। তুর্কীর দোকান যেমন সাজানো; তুর্কীর অফিসও তেমনি আপ-টু-ডেট। কাঁচের পার্টিশন দেওয়া ঘর, টেবিল-চেয়ার-ডেস্ক, টেলিফোন-টাইপরাইটার, লেডি-টাইপিষ্ট, বয়-কেরাণী, চটপটে আদব-কায়দা — সব মিশিয়ে

একটা শ্রদ্ধার ধূনোর গন্ধ পাবে অফিসঘরের চারদিকেতেই।

রাজনীতিতে যেমন গোঁয়ার, ব্যবসায়েও তেমনি গোঁয়ার তুর্কী। কিছু একটা ব'লে গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে থাকবার মুরোদ্ আছে তার। তাকে ভয় দেখিয়ে বা ভুলিয়ে কিছু করা শক্ত। 'ইয়োক' যদি বলে তুর্কী— তার মানে হচ্চে 'না' কথাটির বাবা।

আমাদেরই মত বাড়ি থেকে অফিস-পাড়া অনেকদূর! কাজেই দুপুরে বাড়িতে খেতে যাওয়া ঘটে না। অথচ আমরা যেমন ডাল ভাত-মাছের ঝোল নাকে-মুখে গুঁজে গিন্নীর হাত থেকে ছোঁ মেরে পানটা নিয়ে ছুটি ট্রাম-বাস ধরতে — তা করে না তুর্কী। হয়তো করতো, যদি ওদের গৃহিনীরা আমাদের গৃহিনীদের মতো সুগৃহিনী হ'তো। রাত থাকতে উঠে উনুনে আগুন দিয়ে পয়লা পর্ব চা-হালুয়া, দ্বিতীয় দফায় কর্তার জন্যে রান্না ক'রতে আধুনিক তুর্কী গৃহিনীর ব'য়ে গেচে। তাছাড়া তুর্কী-গৃহিনীকেও তো সাজগোছ ক'রে বেরুতে হবে কাজে। কাজেই কফি-টোষ্ট-মাখন বা দেশি খাবার খেয়েই বেরুতে হয় কাজে, পেট ভ'রে খাবার সময় দুপুরে। রাত থাকতে ওঠা পতি-প্রাণা গৃহিনীকুল অবশ্য আমাদের দেশ থেকেও উধাও হচ্চেন, দেখা দিচ্চে কমরেড-গৃহিনীরা।

দুপুরে তাই রেষ্টুরেণ্ট আর কফিখানাগুলি জম্‌জমাট হয়ে ওঠে। মাংস, বরবটিসেদ্ধ, পিলাউ, (আমাদের পোলাও নয় কিন্তু, মাংসের পিঠে গোছের) দোলমা, (আস্ত তরকারির মধ্যে চাল দিয়ে সেদ্ধ করা) ইয়াগার্ট (দই), আর, সময়কার ফল ইত্যাদি দিয়ে দুপুরের খাওয়াটা খুব খারাপ হয় না তুর্কীদের। তার সঙ্গে খানিকটা 'রাকি' সুরা জমে ভাল। তবে সবাই যে 'রাকি' সুরাসিক্ত হয় তা নয়, বিশুদ্ধ জলও খায় প্রচুর। তুর্কীতে জল, সোডা-লেমনেড বা ফলের রস বেশ চালু। তেলের তৈরি তরকারি ও খাবারই বেশি, তাই জলীয় কিছু না খেলে উপায় নেই। উস্‌কুদারে সাম্‌লাকার পাহাড়ের ঝরণার জল

নাকি হজমের পক্ষে খুব ভাল; তুর্কীতে বিক্রী হয় বোতলে। অবশ্য এমনিতেই এই নিরামিশাষী অরসিকের বেছে খাওয়ার বাই থাকায় —ঐ জলীয় দ্রব্যটির সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হয়নি। তবে তুর্কীর মিষ্টি 'বালকাভা' নিতান্তই মিষ্টি। চিনির রসে ভেজা আমাদের গজার মত। একটি খাওয়ার পরই মুখ মেরে আসবে।

বিকেল পাঁচটায় আবার ভিড়, ট্রামে-বাসে। অফিস-পাড়া বেয়োলু থেকে লোক তখন প্রায় সবাই ছোটে গোল্ডেন-হর্ণের উপর গালাটা ব্রীজের দিকে। সেখান থেকে যার যেথা ঘর — পাড়ি দেয়, নৌকা বা ষ্টীমার ফেরিতে। বেয়োলু থেকে গালাটা ব্রীজ পর্যন্ত একটা টানেল আছে — তার ভিতর রেল লাইন পাতা এবং মেসিনের সাহায্যে লোহার দড়ি বাঁধা লোকভর্তি গাড়ি টেনে তোলা হয় আর নামানো হয়। ফানিকুলার গোছের। ঐ ব্যবস্থাটি করায় অফিস পাড়ায় যাতায়াতের খুব সুবিধা। গালাটা ব্রীজ থেকে বেয়োলু অনেক উঁচুতে এবং ঐটি হেঁটে উঠতে গেলে সকালের সামান্য জলযোগ স্রেফ হজম হ'য়ে যেতো; কাজেই অফিসে গিয়ে কলম ধরার বদলে রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে ধ'রতে হ'তো কাঁটা-চামচ। ঐ যান্ত্রিক যাতায়াতের ব্যবস্থা হওয়ায় লোকে গালাটা ব্রীজ থেকে বেয়োলুতে আসতে পারে — সময়কে ফাঁকি দিয়ে দু'মিনিটে।

টুকটাক জিনিসপত্তর কেনাকাটার ভার তুর্কী গৃহিনীদের উপরেই। কর্তা সহরে কাজে এলে রাজ্যের বাজার ক'রে হামালের ঘাড়ে চাপিয়ে বাড়ি ফেরে। অফিসের ছুটির শেষেও কর্তারা এটা-ওটা-সেটা বাজার ক'রে থাকে—আমাদের কর্তাদের মত। শুধু আমাদের বা তুর্কী-কর্তারা কেন, প্রায় সব দেশেরই হিসেবি কর্তাদের এই কম্মোটি ক'রতে হয়। গিন্নীর ফর্দ কর্তার পকেটে থাকা, শান্তিময় বিবাহিত জীবনের একটি অবশ্যম্ভাবী ব্যবস্থা। 'ফর্দ তোমার চাইনে, আমার সব মনে থাকবে'

ব'লে মর্দ বেরোন খুব গট্‌গটিয়ে—কিন্তু পথে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লে গল্পে মেতে গিয়ে পরে যখন ঢোকেন বাড়িতে খালি হাতে আর দরজায় পা দিতেই মনে প'ড়ে যায় জিনিষ আনবার কথা — তখন প্রায় সব দেশের কর্তাদেরই প্রাণটা ধ্বক ক'রে ওঠে এবং সেক্ষেত্রে সর্বজাতীয়া কুলবতীদের পেনাল কোডের য়্যাক্ট অনুযায়ী শাস্তি হ'চ্চে, মুখনাড়া। অবশ্য, অপরাধ হিসাবে মাত্রার তারতম্য আছে।

তুর্কী কর্তারা বোধহয় খুব সংসারী এবং স্ত্রী-ভীত বা ভক্ত। রাস্তায় হামাল পেছনে, ফর্দ হাতে বহু তুর্কী কর্তাকে দেখা যায় রীতিমত মনযোগ দিয়ে বাজার করতে ব্যস্ত। তুর্কী গৃহিনীর সুন্দর মুখ খানিতে হাসলে যেমন মধু ঝরে, ঠোঁট বেঁকালে তেমনি বিষবৎ। তুর্কী কর্তা তাই হুঁসিয়ার।

তবে ইস্তাম্বুলে বাজার করা. একটা ঝকমারি। সস্তায় ফল কিনতে হ'লে যেতে হবে সেই গোল্ডেন হর্ণের ধারে ইয়েমিজ ইশ্‌কেলেশি বা ফল-পট্টিতে। তারপর মাছ, মাংস, তেল, মাখন কিনতে ছুট্‌তে হবে বালিক-পাজারিতে। তাইতো, মশলাও তো কিনতে হবে! চলো মিশির চারশিসি বা মিশর-বাজারে। টোট্‌কা ওযুধও পাওয়া যায় এ বাজারে অনেক রকম। তাছাড়া, নাকি বশীকরণের ওষুধও পাওয়া যায়, এবং তুর্কী কর্তারা লুকিয়ে দু'চার পুরিয়া কিনে পকেটে ভরে নিশ্চয়ই, নইলে আমদানি হ'তো না জিনিষটার। কিন্তু ওষুধটির কার্যকারিতার বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ আছে — কর্তাদের স্ত্রী-ভীতি বা ভক্তি দেখে।

এমিনন্নুতে কাপালি-চারশি একটি খুব বড় বাজার! এক জায়গায় সব রকমের জিনিষ পাওয়া যায়। বাজারের সদর দরজা মহম্মদ পাশা ষ্ট্রীটে। লোকের ভিড় এই বাজারেই বেশি। দু'চার কুরুশ বেশি দিয়ে হাঁটার দায় থেকে বাঁচতে কে আর না চায়! আর হামাল পেছনে ঘুরলে তো হরে দরে একই পড়ে। এখানে পোষাক, আসবাব-পত্র, গয়না-গাটি বিছানাপত্তর, সেকেলে জিনিষপত্তর, বই, গ্রামোফোন-রেডিও অর্থাৎ

'পেট পুজো'র জিনিষের চাইতে 'মন পুজো'র জিনিষই বেশি পাওয়া যায়।

তুর্কীর নানা জায়গা থেকে হরেক রকম জিনিষ এসে জড়ো হয় ইস্তাম্বুলের বাজারে। গাজী এনতেপ থেকে আসে বাদাম, থান কাপড়, আদানা থেকে আসে তুলো, আফেয়ন থেকে আফিং। ইস্তাম্বুল, আনকারার মত অত নামকরা বড় সহর না হ'লেও ইজমীর তুর্কীর একটি ঘন বসতির সহর। বুরশাও সহর হিসেবে বড়ই। তাছাড়া আরো অনেক ছোট খাটো সহর আছে, তবে সেগুলি গ্রামেরই উন্নত-সংস্করণ — তুর্কীর সহরের লিষ্টিতে লাষ্টের দিকে তাদের নাম উল্লেখযোগ্য। কয়েকদিনের বিদেশী আমি ওদের খবর নিইনি, অবহেলাই করেচি। বিশেষত্ব কিছু নেই তেমন, তাই বিদেশীদের টানতে পারে না কাছে। নতুন কিছু দিতে পারলে, তবেই তো নতুন লোক কাছে আসে!

তবে তুর্কীর সব সহরই প্রায় রেল্ লাইনে মালা গাথা। বড়গুলিতে হাওয়াই জাহাজ গোঁত খায় নিয়মিত। এয়ার লাইনের হাওয়াই স্নুতোয় বাঁধা লকেট সেগুলি। তুর্কী এয়ার লাইনের নাম আছে, চড়ে ভরসা হারাবার কারণ নেই। ল্যাজে চাঁদ-তারা মার্কা মারা বহুত হাওয়াই-জাহাজ ওড়ে কাছাকাছি দেশ বিদেশের আকাশে।

তুর্কী ট্রেনে বেশ ভিড়। থার্ড ক্লাশে চাষীর ভিড়টাই বেশি। ঝুড়ি-ধামা, বোঁচকা-বুচকি নিয়ে দরজা আটকে গাদাগাদি ক'রে এমন বসে থাকে — পা বাড়ানো দায়। আমাদের কাছে এ দৃশ্য নতুন নয়, কাজেই বেশি বোঝানোর দরকার কি? তুর্কী চাষীর কাছে ট্রেনে চড়া — বেশ একটা মজার ব্যাপার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে ব'সে থাকে, নড়েও না চড়েও না — বোধহয় মনে প্রাণে অনুভব করতে থাকে যাত্রা-সুখ-অনুভূতি। তবে একতারা গোছের বাজনা বাজাতে বা বাঁশি বাজাতে শুনেচি, সুরটা মন্দ লাগে না। আনন্দে গান গাইতেও থাকে মেঠো-সুরে।

তুর্কীরা ভারি সংসারী। সংসারের মায়ায় বাঁধা। ছেলে-মেয়েদের

লেখা-পড়ার দিকেও খুব নজর। আহ্‌সেফ্, তুরগুৎ, ফতমা বা সেলিক-এদের কেউ যদি পরীক্ষায় গাড্ডু মারে তো বাপমায়ের মাথায় পড়ে বজ্রাঘাত। বিদেশী ভাষা, বিশেষ ক'রে ইংরজী বা ফরাসী ভাষা শেখার দিকেও নজর দিয়েচে তুর্কীরা। যাদের ব্যবসা করতে হবে, অন্তত আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা তাদের পক্ষে ঐ তুটির একটি ভাষা শেখার দরকারও বটে, তুর্কী তরুণ-তরুণীর বাপ-ঠাকুর্দারা অন্ধকারে কাটিয়েচে, কিন্তু এরা বাস করচে পূর্ণ আলোর রোশনাই-এর মাঝে। যে আলো আতাতুর্ক জ্বালিয়ে গেচেন, তার জ্যোতি যেন দিন-কে-দিন বেড়েই চলেচে। ছোটদের বই-এ থাকে দেশ-ভক্তির গল্প, তাতে লেখা থাকে, তুর্কী জাতি মহান, তুর্কী জাতি অতুলনীয়। এ ব্যবস্থা আতাতুর্কের। তাঁর স্মৃতি-স্তম্ভে লেখা : বুক ফুলিয়ে থাকো, কাজ ক'রে যাও, বিশ্বাস রাখো মনে। একটা জাতির উন্নতির জন্যে যেটুকু অহমিকার দরকার — আছে তা তুর্কী জাতের। তাই তুর্কীর জাতীয় সঙ্গীতের মানে করলে দাঁড়ায় :

মোদের রক্তে তৈরি তুর্কী,
কষ্টেই পাওয়া এ স্বাধীনতা;
তুর্কীরে করে শ্রদ্ধা সবাই—
এ দেশে কোথাও নাই হীনতা।
নতুন পথের ইঙ্গিত এনে
দিয়েচি, তাইতো সবাই জানে—
তুর্কীরা গাঁথা মিলন সুতোয়;
তুর্কীকে তাই সবাই মানে॥

সঙ্গীতে অহমিকার সুর আছে, সহজেই কানে বাজে। কিন্তু জাত যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে, ঠাণ্ডা না হ'য়ে যায়, কাজেই এটুকু অহমিকার তাপ দরকার। এ দোষের নয়। যখন মদগর্বী অন্য দেশগুলো বোমার দুম্‌দাম্ করচে, তখন নতুন-জাগা তুর্কিতে যদি কথার খৈ ফুট্‌ফাট্ বাজেই তাতে ভ্রু কোঁচকাবার কিছু নেই।

তুর্কীর জাতীয় পতাকায় মুসলমানী চিহ্ন — চাঁদ-তারা। তবে পাকিস্থানীদের মত ধর্মের গোঁড়ামী নেই। আমার গায়ের রং দেখে অনেকেই জিগ্যেস করতো, মুস্‌লিম্? পাকিস্থানী? আমি ঘাড় নাড়তাম, হিন্দু! হিন্দুস্থানী! এবং লক্ষ্য করতাম, আমার উত্তর শুনে তাঁর ভ্রূ কোঁচকায় কিনা। না। প্রশ্ন-জিজ্ঞাসক তখনই অসীম আগ্রহে হিন্দুস্থানের খবরাখবর জানতে চাইতোঃ তোমাদের নেহেরু কেমন লোক? তাঁকে তোমরা ভালবাসো? ওখানে এখনো মুসলমান আছে, না, সব পাকিস্থানে চলে গেচে? তোমাদের দেশের কথা আমরা শুনেচি। খুব নাকি চমৎকার দেশ! তবে অনেক রকম ভাষা, না? কী ভাবে কথাবার্তা চালাও নিজেদের মধ্যে? আমাদের দেশটা তোমার কেমন লাগচে? আমাদের লোকজন? তোমার এখানে কোনো অসুবিধে হচ্চে না তো? তোমরা আমাদের দেশে বেশি আসো না কেন? এলেই তো জানাশুনো হয় ··

তুর্কীর লোকজনকে জানবার ইচ্ছে আমার প্রবল। তাই ইচ্ছে ছিল, তুর্কীর কোন মাঝারি ধরণের হোটেলে তুর্কীদের সঙ্গে থাকবো। কিন্তু দেখি P A A লাইনের আমেরিকান প্লেনে তুর্কীতে উড়ে আসাই আমার কাল হ'য়েচে ! তুর্কীর চমৎকার হাওয়াই বন্দরে গোঁৎ খেয়ে নামবার সঙ্গে সঙ্গে Wagon-lits-এর কাঁচে ঘেরা বাসখানা কাষ্টমস্‌এর বেড়া থেকে টেনে এনে ইস্তাম্বুল সহরে যে হোটেলটিতে আমাদের ছেড়ে দিল, সেটি তুর্কীর একটি খানদানী হোটেল। নাম — কোণাক হোটেল্। ইয়ার্কি! এলে হাওয়াই জাহাজে, আর ঢুকবে 'যাত্রী-নিবাসে'? হ্যাঁ, আসতে যদি ট্রেনের থার্ড কেলাসে, উঠতে যদি কোনো ট্যাক্সিতে (ছ্যাকড়া গাড়ি তুর্কীতে নেই, কাজেই)—তা হ'লে কি সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভার নিয়ে আসতো তোমায় এই ভড়ংদার বিরাট হোটেলে? তুর্কীরা দেখচি লোক চেনে (?)!

বেয়োলুর সদর রাস্তার উপরে বিরাট হোটেল। সবিস্তারে হোটেলের রূপ বর্ণণা ক'রে লাভ নেই। চোখ বুজে কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেল

বা গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের রূপ কল্পনা করলেই হবে। কারণ, এটুকু জেনে রাখা ভালো, সমাজের নীচের তলা যেমন, উপর তলাও তেমনি একই ধাঁচের; ফারাক শুধু উনিশ-বিশের। বৈচিত্র যা কিছু মধ্যম শ্রেণীতে।

হোটেলের ম্যানেজারের কাউন্টারে নাম-ধাম লেখাবার ফাঁকে একটি বয় আমাদের সুটকেশগুলো সামনের লিফ্‌টে চাপিয়ে সড়াৎ ক'রে উপরে গেল চলে এবং আর একটি 'বয়' আমাদের আর একটি লিফ্‌টে চাপিয়ে উপরে নিয়ে গিয়ে এক-একজনকে এক একটি ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে 'বো' জানিয়ে বাইরে থেকে দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল।

বিরাট সুসজ্জিত ঘর। দেওয়ালে দামী ওয়াল-পেপার। জানলায় ভারি ভেলভেটের লাল পরদা। সামনে সোনার জলে বাঁধানো প্রকাণ্ড আর্শি। মেঝেয় নরম মোটা কার্পেট, পা ব'সে যায়। ঘরের এক কোনে চওড়া পালংক, তাতে নরম বিছানা পাতা, ঢাকা দেওয়া সিল্কের চাদর। ঘরের মাঝখানে একটি কাঁচ বসানো বাহারি টেবিল; তার চারপাশে চারখানা গদি-আঁটা চেয়ার। টেবিলের উপর কাঁচের জলের কুঁজো, গেলাস, অ্যাশ-ট্রে ইত্যাদি। ঘরের এক কোনে ওয়ার্ডরোব, আর এক কোনে টেলিফোন — 'বয়'কে ডাকবার জন্যে।

জানিনে, এই ঘরের জন্যে ঘাড় ধ'রে কত আদায় করবে! যা করে করুক! এখন নরম শয্যায় খানিকটা হাত-পাগুলো ছড়িয়ে নিইতো! সেই বেরুট থেকে মোটরে আর প্লেনে হাঁটু মুড়ে ঠাঁয় ব'সে থাকা অগ্রগতির যুগে দুর্গতির এক অপরিহার্য ব্যবস্থা!

একঘুম ঘুমিয়ে সন্ধ্যায় 'টার্কিশ-বাথটা' সারলাম। এতদিন স্বদেশে নকল টার্কিশ বাথ সোপ দেখে এসেচি; এবার স্বচক্ষে এদেশী বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম টার্কিশ বাথ সোপ দেখে এবং গায়ে মেখে জীবন সার্থক হ'লো। গোপনে বলি, সাবানটা এমন কিছু আহা-মরি ব্যাপার নয়; আর পাঁচটা সাবানের মতই রূপে-গন্ধে-বর্ণে অতি সাধারণ। আকার

চৌকো। তাছাড়া টার্কিশ বাথরুমে গিয়ে দেখি এ যুগের বিলিতি কায়দার বাথ — অর্থাৎ বাথ-টাব, হট্ এণ্ড কোল্ড ওয়াটার, শাওয়ার, টাওয়েল, লিকুইড সোপ, বাথ সল্ট ইত্যাদির সমাবেশ।

আসলে 'টার্কিশ-বাথ' কিন্তু তা নয়। সেকালীন তুর্কীদের একটি আড্ডাখানা। গরমের দেশ, তাই একটা বড় ঘরে বিরাট একটি জলে ভর্তি চৌবাচ্চা থাকতো গাঁথা। তারই চারপাশে ব'সে সুগন্ধী তেল মর্দনের ব্যবস্থা এবং গড়-গড়ার নল মুখে লাগিয়ে স্রেফ আড্ডা মারা এবং ইচ্ছামত চৌবাচ্চার জলে স্নান সমাপন। তখনকাব দিনের আমীর-ওমরাহ ও ধনী বণিকদের অন্যতম বিলাস ব্যবস্থা। এখন 'বাথ'এর সেই সব চৌবাচ্চা-ঘরগুলি প'ড়ে আছে -- দর্শকদের কাছে দর্শনী আদায়ের উপলক্ষ্য হিসাবে। তবে সে যুগে যেমন 'টার্কিশ-বাথ' নেবার জন্যে কিছু খরচা ক'রতে হ'তো, একালীন হোটেলেও তেমনি বিলিতি-টার্কিশ বাথের জন্যেও দিতে হ'লো বেশ কয়েক কুরুশ — আমাদের প্রায় এক টাকা বারো আনার মতো।

রাত্রে বিরাট সুসজ্জিত ডাইনিং হলে কাঁটা চামচের কল্যাণে বিলিতি-খানায় পেট ভরিয়ে, খানিকটা বেড়িয়ে আসা গেল। আঁকা-বাঁকা অলি-গলি অনেক। আমাদের চীৎপুরী রাস্তার মত ট্রাম-ঠং-ঠঙানো রাজপথও আছে ইস্তাম্বুলে অগুন্তি।

বেড়াতে বেরিয়েছিলাম একটা মাঝারি গোছের বিশুদ্ধ তুর্কী-হোটেল খুঁজে বার করবার চেষ্টায়। তার কারণ ছিল। প্রধান কারণ পয়সা বাঁচানো। এই 'শ্বেতহস্তী-আবাসে' বড়জোর একদিন-দু'দিন থাকা যেতে পারে — বেশ কিছুদিন থাকা মানে, ট্যাঁকের ওজন রীতিমত হাল্কা করা, এবং সে অবস্থায় হাল্কা মনে দেশ দেখা বিপজ্জনক।

খানিক ঘোরাঘুরির পরেই হোটেল মিললো। তুর্কী হোটেলওয়ালা — যাকে বলে বিশুদ্ধ তুর্কী। ইংরিজি এক বর্ণও জানেন না। ভাগ্য

ভালো, চীনে-ইংরেজি জানা এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে গল্প করছিলেন। হোটেলের রেটটা সেই ভদ্রলোকের মারফত জেনে নেওয়া গেল এবং হোটেলের মালিককে ইশারায় ঘরটা একবার দেখাতে বলায় সেটিও উপরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ছোট্ট ঘরখানি। সিঙ্গল্-বেড বিছানা পাতা। ঘরেই ওয়াটার-বেসিনের ব্যবস্থা। আর চাই কি? বললাম, কাল দুপুরে আসবো।

ইস্তাম্বুলে আসবার সময় বেরুট থেকে একটি দায়িত্ব ঘাড়ে ক'রে এনেছিলাম। বেরুটের P A A এয়ার অফিসে ইস্তাম্বুলে যাবার প্লেনের সীট রিজার্ভ করবার সময় সেখানকার এক কর্মচারী অতি বিনয়ে বললেন, ইস্তাম্বুলে যাচ্চেন, আমার একটি উপকার করবেন?

বলুন।

ইস্তাম্বুলে যাবার দিন দুটি সার্ট নিয়ে গিয়ে সেখানে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিলে খুবই উপকৃত হবো।

বললাম, বেশ বেশ।

কাজেই ইস্তাম্বুলে যাবার দিন, ভদ্রলোক আমার সুটকেশে গুঁজে দিলেন সদ্য-কেনা দু'টি বেশ দামী সার্ট — প্রমাণ সাইজের। আর আমার হাতে গুঁজে দিলেন এক টুকরো কাগজ — ইস্তাম্বুলে তাঁর বাড়ির ঠিকানা।

ভদ্রলোকের প্রথম দিনের প্রস্তাবেই আমি একটু চমকে গেছলাম; এবং যাবার দিন তাঁর প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত হ'তে দেখে সত্যিই হতবাক হ'লাম। আমার গায়ে কি সততার রবার-ষ্ট্যাম্প মারা আছে? না, মুখে সে রকম কিছু আঁকা দেখলেন ভদ্রলোক! আমার সঙ্গে তো ভদ্রলোকের আর কস্মিন কালেও দেখা হবে না। অথচ আমি যে অমন প্রমাণ সাইজের দু'টি সার্ট বেমালুম মেরে দেবো না — বরং ব'য়ে নিয়ে যাবো তাঁর বাড়িতে — তার কি নিশ্চয়তা পেলেন ভদ্রলোক

আমার কাছ থেকে ?

সত্যিই মানুষকে আমরা সহজে বিশ্বাস করতে পারিনে, অথচ কত সহজেই না বিশ্বাস করা যায়।

তাই ইস্তাম্বুলের দামী হোটেলের নরম বিছানায় সুখ-নিদ্রায় রাত কাটালেও আমার নৈতিক দায়িত্বের কথা ভুলতে পারলাম না। ব্রেকফার্স্ট সেরে বা'র হ'লাম ভদ্রলোকের ঠিকানা মাফিক ডেরা খুঁজতে।

তুর্কী পুলিশের চেহারা বড় চমৎকার। লম্বা-চওড়া গড়ন; মিলিটারি-মিলিটারি পোষাক, দেখলে বেশ শ্রদ্ধা হয়; কিন্তু লণ্ডন-পুলিশের মত অত পথ-জান্তা নয়। সে সুনামটুকু লণ্ডন 'ববি'রই প্রাপ্য। কাজেই পকেট থেকে কাগজের টুক্‌রোটা বার ক'রে একটি তুর্কী-পুলিশকে দেখাতে সে মনযোগ দিয়ে খানিকক্ষণ দেখে যেভাবে একবার এদিক-একবার ওদিকে অঙুলি নির্দেশ করলো, তাতে বেশ বোঝা গেল লোকটার রাস্তাঘাটের বিষয়ে জ্ঞান খুব গভীর নয়।

যাক্ হাতের ফুর্জিখানা একে ওকে দেখিয়ে কোনমতে হাতড়াতে হাতড়াতে একটা রাস্তার মুখে আসতেই সামনে দেখা পেলাম এক তুর্কী-তরুণীর! তরুণী তন্বী, রূপবতী, আধুনিক তুর্কী-সজ্জায় সজ্জিতা মানে পরণে স্কার্ট, কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ এবং বেশ দ্রুত পায়েই সচলা। চট্ ক'রে আমার হাতের কাগজখানা প্রায় তার নাকের সামনে ধরতেই তরুণী থম্‌কে থামলেন এবং আমার জিজ্ঞাস্য জানাতেই তিনি আমাকে বিস্মিত ক'রে বেশ চোস্ত ইংরেজীতে বললেন, আমি এ রাস্তাটা ঠিক জানিনে, তবে আসুন, দেখছি খোঁজ ক'রে। আপনি বিদেশী ?

হ্যাঁ। পরিচয় দিলাম ঃ ইণ্ডিয়ান।

এবার আরো বিস্মিত হ'লাম। তরুণী তাঁর গন্তব্য পথ পরিহার ক'রে আমাকে নিয়ে উল্টোমুখো হাঁটলেন এবং আশেপাশের দোকানে আর পথের লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে আমাকে নিয়ে এলেন

একটা সরু গলির সামনে। গলির মুখে দাঁড়িয়ে তরুণী বললেন দেখুন, এই আপনার বাঞ্ছিত গলি এবং এই গলিতে নম্বর দেখে গেলেই পাবেন বাড়িটা। তারপর নিজের হাতের রিষ্টওয়াচটা দেখিয়ে প্রায় অপরাধিনীর মত বললেন, আমি নিজেই আপনাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিতাম, কিন্তু দেখুন আমার অফিসের আরো দেরি হ'য়ে যাবে — তাই আপনাকে একলাই ছেড়ে দিতে হচ্চে। আশাকরি কিছু মনে করবেন না।

আমি তাড়াতাড়ি হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলাম, তাতে কি হয়েচে ? আপনার কত অসুবিধা হ'লো ! আপনার কত ক্ষতি করলাম !

এবার তিনি হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন : না, না, কিছু ভাববেন না। আমার কর্তব্য ··

তরুণী আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক ক'রে চলে গেলেন।

কিন্তু আমি ক্ষণেকের জন্যে অচল হ'য়েই রইলাম। চট্ ক'রে তরুণীকে আমার মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। আশ্চর্য ভদ্রতা তো !

গলির নাম — Taksim Mac Sakak Iapace Cikmaz (Kat 3) ২ নং বাড়ীটা খুঁজে নিতে দেরি হ'লো না। তেতলা বাড়ি। সদর দরজার পাশে একজন ছুতোর কাজ করছিল, তাকে Kat 3 তে ফতেমা হানেম-এর কথা জিগ্যেস করতেই বললো, সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে চলে যাও।

বুঝলাম Kat 3 মানে তেতলা। ফ্ল্যাট বাড়ি। তেতলায় উঠে আন্দাজে সামনের দরজায় কলিং-বেল টিপলাম। এক সুনয়নী, সুন্দরী তরুণী দরজা খুলে সামনে এই কৃষ্ণাভ বিদেশীকে দেখেই তার চোখ ছুটি বিস্ময়ে, কৌতুহলে, বুঝিবা কৌতুকে ভ'রে উঠলো।

মৃদু হেসে জিগ্যেস করলাম, ফতেমা হানেম ?

নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললো, সেই ফতেমা। — দরজা

আর একটু খুলে নিয়ে গেল ভিতরে।

চমৎকার সাজানো ছোট্ট ড্রইং-রুম। সোফা, টেবিল, কেবিনেট, ফুলদানী, রেডিও যেখানে যেটি থাকা দরকার, আছে। ফতেমা ইংরেজী জানে না, কাজেই ইশারায় আমাকে একটা সোফায় বসতে বলে ডেকে নিয়ে এলো এক বর্ষিয়সী মহিলাকে, হয়তো ওর মা। তিনিও তথৈবচ। মুখ দিয়ে এক বর্ণও ইংরেজী বেরোয় না।

অতএব বাধ্য হ'য়ে ইশারায় কাজ চালাবার চেষ্টা করলাম। নিজের সার্টটা দেখিয়ে হাত নেড়ে বললাম : বেরুৎ-ইস্তাম্বুল — হুস্। অর্থাৎ বেরুট থেকে ইস্তাম্বুলে উড়ে এসেচি, সঙ্গে এনেচি সার্ট। দুটো আঙুল দেখিয়ে বললাম — টু সার্টস্।

বুঝলাম, কিছুই বুঝলো না ; মা কিংবা মেয়ে। বরং সকৌতুকে হাসতে লাগলেন, আমিও। এ তো বেশ মজা হ'লো ! এখন বোঝাই কী ক'রে ? তাঁদেরও ঐ একই সমস্যা : এ বিদেশীর কথা আমরা বুঝি কি ক'রে ?

আমি নিজের বুদ্ধিকেই দোষ দিলাম, আর বেরুটের হাওয়াই জাহাজী সরল ভদ্রলোকের কম বুদ্ধির কথাও মনে হ'লো। ইংরেজের এবং ইংরেজীর উপর আমাদের অসীম শ্রদ্ধা ; কাজেই ইংরেজী মারফত আমার বক্তব্য বোঝাতে পারবো, এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু ভদ্রলোকের তো উচিত ছিল, এক টুক্‌রো কাগজে শুধু ঠিকানাটুকু না লিখে, তাঁর স্বদেশী ভাষায় একখানা চিঠি লিখে দেওয়া ! ভদ্রলোকের নামও জানিনে, যে বলবো। এমন যে হবে জানলে পথে দেখা তরুণীর অফিস কামাই করিয়েও না হয় তাকে নিয়ে আসতাম। এখন খেয়াল হ'লো, এঁরা না ভেবে বসেন, কোন বদ মতলবে আমার আসা !

না, সে রকম কোন আশংকা নেই বোঝা গেল। ফতেমা তার মুখের কাছে কাপ ধরার ভঙ্গী ক'রে দেখালো, চা খাবে ? তার মা-ও ঘাড় নেড়ে বললেন, খাও, খাও। আমিও সানন্দে ঘাড় নাড়লাম, দাও।

বুঝলাম, আতিথেয়তা ভাষার অপেক্ষা রাখে না। আর মেয়েদের আদর-যত্ন বুঝি সব দেশেই সমান।

আমি আর একবার চেষ্টা করলাম বোঝাতে : মী ইন্দিয়ান — কালকুত্তা — বেরুৎ — ইস্তাম্বুল — টু-সার্টস্ — হুস্! নাও কোনাক ওতেল্!—উচ্চারণ সব ফরাসী কায়দায় করলাম, যদি বুঝতে পারেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

মা ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ বুঝলেন না কিছুই। হাতের ইশারায় বললেন, ব'সো চা ক'রে আনি।

ফতেমা বললো ইশারায় : কোনাক ওতেল্?

তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়লাম : হুঁ হুঁ!

অর্থাৎ ভাব ভঙ্গীতে বোঝা গেল, আমার প্রতি মেয়েটির শ্রদ্ধার পাল্লা বোধকরি তড়াং ক'রে বেশ কয়েক ডিগ্রী বেড়ে গেচে। ভাবটা : বিদেশী বেশ শাঁসালো!

হঠাৎ ফতেমা ইশারায় 'আসচি' ব'লে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই ডেকে নিয়ে এলো এক ভদ্রমহিলাকে। বয়েস বেশি নয়। বছর ত্রিশের মধ্যেই। খুব স্মার্ট। ঘরে ঢুকেই আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক ক'রে অনর্গল ফরাসী বলতে লাগলেন। হয়তো ভাবলেন, ফরাসী ভাষায় আমি পণ্ডিত। কিন্তু যখন তিনি আমাকে ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়তে দেখলেন তখন তাঁর খেয়াল হ'লো, লোকটা ফরাসী ভাষায় একজন গণ্ডমূর্খ! অথচ, কী আশ্চর্য, এই আমি, বি, কম পাঠ্যে ফ্রেঞ্চ নিয়েছিলাম, পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং পাশ ক'রেছিলাম সসম্মানে। এবং এখন দেখচি অনভ্যাসের রাজমিস্ত্রী মনের দেওয়ালে আঁকা ফরাসী ভাষার উপরে দিব্যি ক'রে চুণকামের পোঁচড়া বুলিয়ে দিয়ে গেচে।

তাই তুর্কী মহিলা যখন আমাকে ঘাড় নাড়তে দেখে জিগ্যেস করলেন ফরাসী ভাষায় : পার্লে ভু ফ্রাঁসে? — আমি অম্লান বদনে ঘাড় নেড়ে বললাম, না।

কাজেই ভদ্রমহিলাই যেন অপ্রস্তুত হলেন। শুধু মিষ্টি হাসতে লাগলেন। আমিও হাসলাম, ফতেমাও। একটা হাসির হাল্কা আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'লো।

এমন সময় মা আনলেন চা আর বিস্কুট। মাথা নত ক'রে ধন্যবাদ জানিয়ে কাপে চুমুক দিয়ে দেখি কফি! তুর্কীতে চা চাইলেই পাওয়া যায় না। দামী পানীয়।

হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি এলো। ইশারায় নিজের সার্ট দেখিয়ে বললাম, সার্ট — কোনাক — ওতেল — কাম! .. হাতছানি দিয়ে বললাম, এসো যাই।

শুনেই ফতেমা স্রেফ নেচে উঠলো। বুঝেচে সে আমার কথা। তুর্কী ভাষায় কি যেন বললো সে এবং তখুনি টেবিল থেকে পাউডারের পাফ্‌টা নাকের ডগায় আর গোলাপা গালে বুলিয়ে নিয়ে, হাই-হিল জুতোয় পা গলিয়ে, পরণের স্কার্টটা টানটুন ক'রে বললো, চলো।

অর্থাৎ এ মেয়েও আমায় বিস্মিত করলো।

কথা নেই, বার্তা নেই, একটি বিদেশী পর-পুরুষের সঙ্গে চললো একটি যুবতী মেয়ে। না, আতাতুর্ক তুর্কী মেয়েদের সত্যিকারের স্বাধীন দেশের জেনানা তৈরি ক'রে ছেড়েচেন!

দু'হাত জোড় ক'রে ফতেমার মা আর ভদ্রমহিলাকে ভারতীয় ভঙ্গীতে নমস্কার জানালাম। দেখে ভারি খুশি হ'লেন তাঁরা। হেসে হাত জোড় ক'রে তাঁরাও ভারতীয় ভঙ্গীতে জানালেন প্রতি-নমস্কার।

ফতেমা আর আমি বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়।

কোনাক হোটেল ফতেমার অজানা নয়। বরং সর্ট-কাট তার জানা আছে। কারণ, এ গলি-সে গলি দিয়ে দিব্যি সে আমায় নিয়ে চললো এবং আড়চোখে আমার দিকে এক একবার চেয়ে চেয়ে হাসতে লাগলো। আমিও অবশ্য হেসে শোধ দিতে লাগলাম। বুঝলাম, ভাষা-না-জানা একজন নতুন রংয়ের এবং ঢংয়ের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যেতে

তার ভালোই লাগচে !

কিন্তু আমি আড়চোখে লক্ষ্য ক'রতে লাগলাম আর একটা জিনিষ! গলিতে দোকান-পাট রয়েচে, লোকজন বেচাকেনা ক'রচে, কফিখানাও আছে, আর কফিখানায় নানা বয়সের তুর্কীরা বেঞ্চিতে বসে কফির পেয়ালা হাতে দিব্যি খোসমেজাজে আড্ডা মারচে — অথচ আশ্চর্য, আমার মত একটি কালো-কোলো বিদেশী তাদের দেশের একটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে হাসতে হাসতে তাদেরই নাকের সামনে দিয়ে চলেচে — তা' কেউ দ্রষ্টব্য ব'লেই মনে করচে না যেন! ধরো যদি, আমাদের পাড়ার কোন গলি দিয়ে একটি বাঙ্গালী মেয়ে একটি সাহেবের সঙ্গে যায়, তবে চায়ের আড্ডার বা রকাড্ডার লোকগুলির চোখ কি চোখালো হ'য়ে ওঠে না? না, জিবটা লক্‌লক্ ক'রে উঠে দু'টো রসের মন্তব্য দেয় না ছুঁড়ে?

তুর্কীরা এদিক দিয়ে উদার মতাবলম্বী দেখচি।

কোনাক হোটেলে এলাম আমরা। ফতেমাকে নিয়ে গেলাম রিসেপসনিস্টের কাছে এবং তাকে ইংরেজীতে বললাম আমার বক্তব্য। লোকটি তখন বিশুদ্ধ তুর্কী ভাষায় ফতেমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেই সে একগাল হেসে আমার হাতটা টেনে নিয়ে ঝাঁকিয়ে দিলো; হ্যাণ্ড-শেক্ মারফত জানালো ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা। জানা গেল বেরুটের ভদ্রলোক ফতেমার দাদা আর সার্ট দু'টি, দাদার এক বন্ধুর জন্যে।

ফতেমা না হয়, এক কথায় আমার সঙ্গে হোটেল পর্যন্ত এলো, কিন্তু তা ব'লে তাকে আমার ঘরে ডেকে নিয়ে যাওয়া ভালো দেখায় না। কুমারী সোমত্ত মেয়ের চলা ফেরা, যতই হোক, সীমাবদ্ধ! কাজেই আমি ফতেমাকে সামনের সোফায় বসতে ব'লে, লিফ্‌টে উপরে গিয়ে সার্ট দুটো নিয়ে নেমে এলাম নীচেয়।

সার্ট দুটো ফতেমার হাতে দিয়ে, তাকে রিসেপসনিস্টের কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম, মেয়েটিকে বুঝিয়ে দাও, তাকে এতটা টেনে

আনার জন্যে বিশেষ দুঃখিত। আরো একটু জানিয়ে দাও, তাদের বাড়িতে আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ।

লোকটি তুর্কী ভাষায় আমার বক্তব্য বুঝিয়ে দিতেই ফতেমা সার্ট দুটো কাউন্টারে রেখে তার দু'হাত দিয়ে আমার ডান হাতখানা চেপে ধরলো আবেগে। ভাবটা : তুমি একি কথা বলচো বিদেশী! তুমিই তো কষ্ট করলে। বরং তোমাকে পেয়ে আমরা ধন্য।

কাজল কালো ডাগর চোখ দুটো তার সজল হ'য়ে উঠলো বুঝি! আর দাঁড়ালো না সে। সার্ট দুটো হাতে নিয়ে স্কার্ট দুলিয়ে চলে গেল ফতেমা।

হোটেলের পালিশ করা মেঝেতে তার হাই-হিল জুতোর শব্দ হ'তে লাগলো—খট্ খট্ খট্ খট্!

চব্বিশ ঘণ্টা পরম আরামে থাকবার এবং খাস বিলিতি কায়দায় ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার খাওয়ার দক্ষিণা লাগলো তুর্কী-টাকায় আঠারো লিরা পঞ্চাশ কুরুশ, আমাদের প্রায় সাঁইত্রিশ টাকা। পত্রপাঠ সেটি দিয়ে দুপুরে একটা ট্যাক্সিতে সুট্‌কেশ চাপিয়ে চলে এলাম নতুন গেরস্ত-পোষা হোটেলে।

Tepebasi, Kallavi Sok রাস্তার ৩০ নং বাড়িটা Hotel Yeni Istambul Palas. সেটি খাঁটি প্যালেস না হ'লেও কম আরাম-দায়ক নয়, অন্তত সে কথাটা হোটেলের তুর্কী-মালিক ফরাসী এবং চৈনিক-ইংরেজীতে ভাবী-খদ্দেরকে সবিস্তারে জানাবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেচেন সদরে সাইন-বোর্ডে। যথা :

The best and cleane Familly Hotel — chip
priece — cleane service are Hotel at yours
service Every time.

কোন ইংরেজের পক্ষে এই ধরনের তুর্কী-ইংরেজী দেখে মূর্ছা যাবার কথা, কিন্তু ইংরেজীর শ্রাদ্ধে আমার কী আসে যায়! আমার লক্ষ্য,

যাতে টাকার শ্রাদ্ধ না হয়। কাজেই পরম নিশ্চিন্ত হ'য়ে হোটেলের ঘরটি দখল ক'রে ইস্তাম্বুলের দ্রষ্টব্য দেখায় মন দিলাম।

ইস্তাম্বুলে 'সেন্ট সোফিয়া' একটি বিচিত্র বস্তু। বিরাট জায়গা জুড়ে গম্বুজের টুপি-মাথায় এই অট্টালিকা ; চারদিকে চারটি উঁচু মীনার — তাজমহলের কথা মনে করিয়ে দেয়। ১০৮ স্তম্ভের উপরেই এই 'কীর্তি'-টির ভরসা বা দম্ভ। দম্ভই বা বলি কী ক'রে? ইতিহাসের কাছে শেখা, মানুষ যেমন বহুবার রাজ-শাসনের ধাক্কায় রাজ-ধর্মান্তরিত হ'য়েচে, কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বা বাধ্য হ'য়ে ; তেমনি শাসকদের পাল্লায় প'ড়ে 'সেন্ট-সোফিয়া'ও তার ধর্ম বদলেচে তিন-তিনবার, তবে নাম বদলায়নি। যিশু গত হবার পাঁচশো বছর পরে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এই খ্রীস্টান গির্জাটি নির্মান করান — স্থাপত্য-শিল্পী এন্টিমিউস এবং ইজিডোরার সাহায্যে। প্রায় ন'শো বছর পরে তুর্কীর সুলতানদের কৃপায় 'সেন্ট-সোফিয়া'কে প'ড়তে হ'লো কল্‌মা — অর্থাৎ গির্জা হ'লো মস্‌জিদ। অথচ দেওয়ালে খোদাই করা রইলো 'শিশু যিশুকে কোলে নিয়ে মেরী-মাতার ছবি।' আজও তা আছে। বহু মস্‌জিদের এই ধরনের কলংকময় জন্ম-বৃত্তান্ত আমাদের অন্তত অজানা নয়। ভারতের বহু তীর্থক্ষেত্রে ধর্মান্ধের জ্বলন্ত অপকর্মের সাক্ষী আজও দাঁড়িয়ে আছে। তুর্কীতে আতাতুর্ক ধর্মান্ধ ছিলেন না, তাই 'সেন্ট-সোফিয়া'কে মস্‌জিদের বন্ধন থেকে দিলেন মুক্তি। 'সেন্ট-সোফিয়া' এখন মিউজিয়াম।

সিরাগ লিও প্যালেস মিউজিয়ামটি তুর্কীর বহু পুরা-কীর্তি আগলে নিয়ে বসে আছে। এই প্রাসাদেই ছিল অটোম্যান তুর্কী সুলতানদের দরবার। গত পাঁচশ' বছরের তুর্কী-ঐতিহ্য যেন থরে থরে সাজানো এর ঘরে ঘরে। ধন-ভাণ্ডার বা হারেম আজ খালি ; সেখানে ধন-রত্ন বা নারী-রত্ন কিছুই আজ নেই বটে, তবে সুলতানী আমলের যে সব নমুনা রয়েচে, তা সত্যিই দেখবার মত।

অটোম্যান সুলতানরা আগে ব্যবহার করতেন, পাগড়ী, পরে

পাগড়ী-cum-ক্যাপ, এবং শেষ দিকের সুলতানরা শুধুই ক্যাপ। তাঁদের ব্যবহৃত ঢাল, তরবারি, তীর-ধনুক, গদা, বর্শা, পিস্তল, রাজদণ্ড, নানা রকমের পোষাক-আশাক, এবং গৃহস্থালীর হরেকরকম্বা জিনিষ-পত্র দেখতে দেখতে কখন যেন চলে যেতে হয় সেই সুলতানী আমলে।

সেকালীন সুলতানী আমেজ আর মেজাজ নিয়ে মিউজিয়াম থেকে বেরুবার সময় সিংদরজার মুখে হঠাৎ আলাপ হ'য়ে গেল অতি-আধুনিক এক ফরাসী তরুণের সঙ্গে : মিচেল! সেকেলে স্বপ্নঘোর কাটিয়ে একেলে অতি-বাস্তবের সঙ্গে করলাম হ্যাণ্ডশেক।

মিচেল-এর বর্ণনার বিশেষ দরকার। প্যারির বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র সে। খাস প্যারিতেই বাস অথচ প্যারির ফ্যাশন তাকে 'কাবু' করতে পারেনি। কদম-ছাঁট সোনালী চুল। চোখে মোটা লেন্সের চশমা। গায়ে খাকি হাফ-সার্ট ; পরনেও খাকি হাফ-প্যান্ট : তার ঝুল হাঁটু থেকে এক ফুট উঁচুতে—প্রায় জাঙ্গিয়া! পায়ে হাফ-মোজা এবং বুট-জুতো। কাঁধে একটা মিলিটারি ব্যাগ।

মিচেলের কাছে 'ইন্দিয়া' একটি রোমান্টিক দেশ! পার্কে বসে তার সঙ্গে কথায়-বার্তায় বুঝলাম, তার ধারণা ইন্দিয়ায় তাজমহল, বম্বে, কালকুত্তা, ঘন বন আর বড় বড় হাতি, বাঘ, বিষধর সর্প—সব প্রায়ই 'গলাগলি' ক'রে বিরাজ করচে! কাঁটায়-বসা পাগড়ি-মাথায় ইন্দিয়ান-ফকিররা নাকি বায়ুভুক এবং তারা ইচ্ছামত হাওয়ায় উড়ে বেড়াতে পারে। তা ছাড়া রোপ-ট্রিক বা শূন্যে দড়ি খাড়া ক'রে তর্‌ তর্‌ ক'রে উঠতে পারে প্রায় সব ইন্দিয়ানরা!

হেসে বললাম, আমি কিন্তু পারিনে।

মিচেল্ বললো, ছোট বেলায় মার কাছ থেকে, বড় হ'য়ে বন্ধুদের কাছ থেকে তোমাদের দেশের কত কথাই শুনেচি।

বললাম, রূপ-কথা শুনেচো। আসল খবর জানতেই পারোনি।

বললে, তোমার ড্রেস্ দেখে, তোমার কথা-বার্তা শুনে এখন তাই মনে হচ্ছে।

বললাম, এই জন্যেই তো দেশ-ভ্রমণের দরকার। নিজের চোখে দেখার মত আর কিছু নেই। আমাদের দেশে গেলে দেখবে সেখানে বম্বে-কলকাতা ছাড়াও বহু বড়-বড় সহর আছে। সহরে বড় বড় বাড়ি আছে। রাস্তায় হরেক রকম গাড়ি আছে। সেখানে ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়ে, সিনেমায় লাইন দেয়, রেষ্টুরেণ্টে সাহিত্য, রাজনীতি, ফুটবল ইত্যাদির আলোচনা করে, মেয়েরা গট্‌মট্ ক'রে চলে, পুরুষরা দশটা-পাঁচটা অফিস করে, বৃদ্ধেরা পার্কে হাওয়া খায়। আরো বললাম, সেখানে তাজমহল নীল আকাশের গায়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নিজস্ব মহিমায়, গভীর বনে বিচরণ করচে বাঘ ভাল্লুক; রাজনৈতিক বিষাক্ত সাপ পৃথিবীর সব সহরেই থাকে, কিন্তু আসল কোবরা থাকে বনেই। প্রকৃত ফকির বা সাধুরা থাকেন হিমালয়ে। তাঁরা সাধনায় মগ্ন; ইচ্ছা তাঁদের আয়ত্বের মধ্যে।

মিচেল মনযোগী ছাত্রের মতই আমার কথাগুলো গিলছিলো। আমি থামতেই সে বললো, মঁসিয়ে গস্, আজ সত্যিই আমার অনেক ভুল ধারণা দূর হ'লো। মার্সি। ধন্যবাদ।—আরো বললো মিচেল: নিজের চোখে অন্য দেশ দেখবার জন্যেই তো নিজের দেশ ছেড়ে বেরিয়েচি। তবে 'ইন্দিয়া'য় যাবার মত অত পয়সা নেই আমার, তবে ইচ্ছে আছে।

ব'লেই হেসে বললো মিচেল: নইলে দেখচো না আমার ড্রেস? এই আমার ইভিনিং ড্রেস, স্লিপিং স্যুট্। খাই কোন কম-দামী রেঁস্তোরায়, শুই এখানকার ওয়াই-এম-সি-এর 'লবি'র সোফায়। কিছু ফ্রাঁ জোগাড় ক'রে এক পোষাকেই বেরিয়ে পড়েচি মঁসিয়ে গস্। নেশা, দেশ দেখা।

ছেলেটিকে বড় ভাল লাগলো। বললাম, যাত্রা তোমার শুভ হোক। আশা তোমার পূর্ণ হোক। সংস্কৃত আউড়ে দিলাম: যাদৃশী ভাবনার্যস্য

সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ইংরেজিতে বললাম, where there is a will there is a way. মিচেল হ্যাণ্ডশেক ক'রে বললো, মার্সি!

ইস্তাম্বুলে বাকি দিনগুলো মিচেল আর আমি প্রায় একসঙ্গেই কাটালাম। কখনো গালাটা ব্রীজের কাছে, কখনো বা বেয়োলুর কোন পার্কে, অথবা কোন রেষ্টুরেণ্টে দেখা করবার জায়গা ও সময় ঠিক হতো আমাদের। পরদিন সেই নির্ধারিত জায়গায় এবং সময়ে (আশ্চর্য, আমি সময় রাখতাম ঘড়ি ধ'রে) দেখা হ'তো আমাদের এবং আমরা পা চালাতাম দেশ-ভ্রমণের জ্ঞান-যাত্রায়। জল তৃষ্ণা পেলে পথের পাশে কোন রেষ্টুরেণ্টে দু'বোতল 'বেগুজ' বা লেমনেড নিয়ে বসতাম, কখনো বা দু'কাপ কফি।

সুলতান আমেদ মস্ক্ বা ব্লু-মস্ক্ ইস্তাম্বুলের অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য। ছয় মিনারের মস্‌জিদ — পৃথিবীতে এই একটিই এবং এই মস্‌জিদের স্থাপত্য-শিল্পের জন্যে বাহাদুরী যাঁর প্রাপ্য, তাঁর নাম স্বর্গীয় সেদেফকার মহম্মদ আগা।

আজ থেকে প্রায় সতেরো শ' বছর আগেকার তৈরি সেন্টিমান সেভেরাস-এর কীর্তি হিপ্পোড্রাম এবং প্রায় হাজার বছর পূর্বের সম্রাট কনষ্টানটিন সপ্তম পরফিরোগেনেট্-এর বিজয়-স্তম্ভ কিংবা চোদ্দ শ' বছরের পুরোন সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের অক্ষয় কীর্তি ইয়ারে বাতান সারায় ইত্যাদি ইস্তাম্বুলের মূল্যবান ঐতিহাসিক সম্পদ।

ইয়ারে বাতান সারায়, আসলে বাইজান্টাইন আমলের একটি ভূগর্ভস্থ জলাধার। সুদূর বেলগ্রেডের বণ্যভূমি থেকে জল আসতো এই জলাধারে পাকা নালার মাধ্যমে। এ জল পানীয় ছিল না, শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হ'লে সহরের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা হিসাবেই ছিল এর ব্যবহার প্রায় ৪২০ ফুট লম্বা এবং ২১০ ফুট চওড়া জলাধারে আজো প্রায় দু'মানুষ জল। তবে পাকা নালায় আর সে জলস্রোত নেই। সময়ের

ধুলো বালিতে বুজে যাওয়া নালা দিয়ে এখন সামান্য জল আসে চুইয়ে চুইয়ে।

ইস্তাম্বুলে সুলেমান দি ম্যাগনিফিসেন্ট-এর মস্‌জিদ যদিও মাত্র চারশো বছরের পুরোন, তবু নাম-ডাক খুব। মহান সিনান আগার নিপুণ স্থাপত্য-বিদ্যার স্বাক্ষর বহন করচে এই ইমারতটি। জানলায় রঙীন কাঁচের কারুকার্য সত্যিই বিস্ময়কর।

তাছাড়া থিয়োডোসিওস-এর স্মৃতি-স্তম্ভ (৩৯০ খ্রীষ্টাব্দের বস্তু) কিংবা এই সেদিনের অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কাইজার উইলিয়ামের ফোয়ারা এবং আরো হালের কামাল আতাতুর্কের স্মৃতিস্তম্ভ — অর্থাৎ সব রকমের প্রবীণ এবং নবীন স্মৃতি বহন ক'রে সেদিনের কনস্ট্যান্টি-নোপল বা ইস্তাম্বুল সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে পূব-পশ্চিম দুই ভূ-ভাগে তার দুটি পা স্থাপন ক'রে। এ যেন হাজার বছরের বৃদ্ধা তার জরাকে জয় ক'রে যুবতীর বেশে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বের মনকে জয় করবার আশায়।

ইস্তাম্বুলের সব রাস্তা না হোক, অনেক রাস্তাই ট্রাম লাইনে বাঁধানো। সরু আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে ট্রামগুলো সশব্দে চলে এঁকে বেঁকে। ১১, ১২, ১৬, ১৯ নম্বরের ট্রামগুলো বেয়োলু (পেরা) থেকে ঠং ঠং করতে করতে চলে সেন্ট সোফিয়া বা ব্লু-মস্ক্ কিংবা বিয়াজিৎ স্কোয়ার পর্যন্ত। ২৩নং ট্রামের গন্তব্যস্থল ওর্তাকয় থেকে আকসারে তক। আর ৩৪ নম্বরের রুট্ বেসিকতান থেকে ফাতি পর্যন্ত। এই রুট্ গুলিই জনাকীর্ণ—ইস্তাম্বুলের নামকরা রাজপথ। ট্রামের ভাড়াও খুব বেশি নয়, তাই সাধারণ সহুরে তুর্কীরা দু'পা হেটে যাওয়ার চাইতে দু'চার কুরুশ খরচ করতে পেছপা হয় না। ট্রামে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ২০ কুরুশ —দ্বিতীয় শ্রেণার ১৫ কুরুশ।

আগেকার তুর্কীরা ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে ঘুরতো ফিরতো, লড়াই

করতো ; আজকের তুর্কীরা কিন্তু 'ঘোড়া' থেকে খোঁড়া হ'য়ে গেচে আমাদেরই মত।

তাছাড়া বসফরাস প্রণালী পার হ'য়ে ওপারে যাবার জন্মে ফেরী ষ্টীমার চলচে অনবরত। এপারের মানুষ ওপারে যাওয়া বা ওপারের মানুষ এপারে আসা এবং কাজের শেষে বাড়ি ফেরবার তাড়া—কাজেই শুধু ফেরী ষ্টীমার নয়, ষ্টীম লঞ্চ, নৌকোর জন্মেও পারের কড়ি রোজই খরচা করতে হয় ইস্তাম্বুলের তুর্কীদের। গালাটা ব্রীজ থেকে ওপারে ইয়াপ, উস্কুদার, বিউক আফা, সেমি পাশা ইত্যাদি ঘাটগুলিতে দিনে-রাতে মেহনতী মানুষদের ভীড় প্রায় লেগেই আছে। আর পারের কড়ি হিসেবে প্রতিবারে খসাতে হয় ২০ কুরুশ থেকে ৬৫ কুরুশ পর্যন্ত—দূরত্ব হিসেবে।

ইস্তাম্বুলে ট্যাক্সিগুলি বিশুদ্ধ মার্কিন জাতীয়া এবং হাল ফ্যাসানের, কাজেই দেখলে ভক্তি-শ্রদ্ধা মনে জাগা স্বাভাবিক। অথচ ভাড়াও খুব যে বেশি তা নয়! ফ্ল্যাগ ডাউন করলেই ৬০ কুরুশ এবং তারপর মাইল্ মেপে মেপে মিটারে যা উঠতে থাকে তাতে ট্যাক্সি চাপ্‌নেওয়ালা-দের বুক এমন কিছু ধড়াস্ ধড়াস্ করে না।

সেকেলে বৃদ্ধা কনস্টান্টিনোপল যদি ভোল বদলে এবং সিনেমা-ষ্টারদের মত নাম বদলে 'ইস্তাম্বুল' হ'তে পারলো—তবে তাম্বুলে ঠোঁট রাঙিয়ে মিষ্টি হেসে হাতে তাম্বরিণ নিয়ে যদি নাচতে নামে—তাতে এমন কি দোষের! অতএব ইস্তাম্বুলে নাইট ক্লাব দেখলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কার্ভান সারে, কর্ডন ব্লো, টাকসিম কাসিনো-তে তাই প্রতি রাত্রেই সফেন স্থরা, সঙ্গীতের সুর আর ঘুঙুরের বোল ইস্তাম্বুলের রাতের বাতাসকে মাতাল ক'রে তোলে।

Istambul Palas-এ আমার শুধুথাকার ব্যবস্থা। ভোজনং যত্রতত্র। হোটেলের বাঁধা 'মেনু' মাফিক খাদ্য 'মুখস্থ' না ক'রে ঘুরতে ঘুরতে

কোন রেষ্টুরেণ্টে ঢুকলেই হ'লো। নানা রকম তুর্কী-খাদ্য চাখ বার অপূর্ব সুযোগ।

তুর্কীরা রাঁধে ভালো। যেন রন্ধনে দ্রৌপদী। রেষ্টুরেণ্টেও নানা পদের খাদ্য। তবে বেশির ভাগই মাংস-জাত। কাজেই আমার একটু বিপদ। মাংসের ভোজে অংশ নিতে রুচিতে বাধে, তবে ছোঁয়া-ছুঁইতে দোষ দেখিনে। তাই, রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে 'এটা কি-ওটা কি' ক'রে দেখিয়ে নিরামিষ খাদ্য-দ্রব্য প্লেটে তুলতে বলি। কুরুশ-নোট দোকানীর হাতে দিয়ে, হাত পাতি বাকি ফেরতের জন্যে। দোকানী ঠকায় কিনা জানিনে, তবে আর পাঁচজন তুর্কী খদ্দের দাঁড়িয়ে থাকে সামনে; তারাই ভাবে-ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দেয় হিসাবটা। স্বদেশে বিদেশী ঠকলে দেশের বদনাম যে! এই 'সুমতি' টুকুই আমার ভরসা!

তুর্কীতে দই-মাখানো ভাত—এক নতুন ধরণের খাবার। খেতে ভালোই লাগে। তাছাড়া আমাদের মত মশলার শ্রাদ্ধ করা হরেকরকম তরকারি, আলুর ঝোল, ভাজা আর মোটা-সোটা রুটি। পাউরুটিরও সম্মান আছে তুর্কীতে।

তাছাড়া তুর্কীর আর একটি খাদ্য বিশ্বখ্যাত। Turkish Delights. ভেবেছিলাম, না-জানি কী! তাই মুখের 'লালা' কোন রকমে সংযত ক'রে দোকানীর কাছে বস্তুটি চাইলাম এবং পেলাম যখন প্লেটে—দেখি, ও হরি, এ যে আমাদের রসে-ভেজানো গজা! আমাদের হেলা-ফেলা গজা যে তুর্কীতে অমন দিগ্‌গজ্ হ'য়ে খাদ্য-জগতে বিরাজ ক'রচে, তা কে জানতো! এক কামড় খেয়ে বললাম মনে-মনে: ওরে গজারে তোর ভাগ্যে এত সম্মানও ছিলো রে! শুনে গজা কি যেন গজ্‌গজ্ করলো নিজের মনে; পরে মিষ্টি মুখে বললো: দাদা, চুপ করো, শুনতে পাবে। তুমি যেন আমাকে চেনো, এরা তো আর চেনে না! এদের কাছে আর মানটা আমার খুইয়ো না।

তাছাড়া রসে তখন মুখটা মেরে গেছলো। কাজেই বিরস কিছু

বললাম না আর দোকানীকে। দামটা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

তুর্কীর খবরের কাগজ কিন্তু উঁচু জাতের। কাগজের পাতায়-পাতায় ছবি। ফুটবল খেলার ছবিগুলি জীবন্ত। খেলোয়াড়ের ব্যাট-চালনা বা বল কিক্ করবার বিভিন্ন ভঙ্গীর একাধিক ছবির সমাবেশ—সত্যিই নয়ন-মুগ্ধকর। তাছাড়া 'কমিক' ছবিও বহুৎ। ক্রশ-ওয়ার্ড এর ছকও আছে। কোন মস্‌জিদ বা প্রাসাদ কিংবা কোন দ্রষ্টব্যের সচিত্র বিবরণ কাগজগুলির বাড়তি আকর্ষণ। রোমাঞ্চকর অভিযান, বৈজ্ঞানিক তথ্য বা সিনেমা-থিয়েটার, নাইট-ক্লাবের প্রোগ্রাম ইত্যাদি তো আছেই। রঙিন কার্টুনেও কাগজগুলি কণ্টকিত। মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ, হোটেল, ব্যাঙ্ক, ইন্সিয়োরেন্স, জুতো, ওষুধ, মলম, বেবীফুড নানাবিধ সচিত্র বিজ্ঞাপনগুলি চমৎকার ভাবে পাতায় পাতায় সাজানো। বোঝা যায়, তুর্কীরা বিজ্ঞাপনের মূল্য বোঝে।

তুর্কীর মেয়েরা স্বাধীন বটে, অফিস-কাছারিও করচে তারা, বাজার হাটেও যায় অনেকেই—কিন্তু আজও হোটেল পর্যন্ত পা বাড়ায়নি কেউ। কাজেই বড় কিংবা ছোট, সব হোটেলেই 'বয়'য়ের ব্যবস্থা, ইয়োরোপের হোটেলের মত 'মেড'-এর কোন আমদানী নেই। এ বিষয়ে তুর্কী খাঁটি প্রাচ্য।

হোটেলের 'বয়'গুলি কাজকর্মে ভারি দুরস্ত। খুব চট্‌পটে। হাতে বাড়তি কয়েক কুরুশ গুঁজে দিলে বাড়তি যত্ন-আত্তিও করে। অবশ্য, তা সবাই করে।

আমার Hotel Istambul Palas এর 'বয়'টির যেমন চমৎকার চেহারা, তেমনিই চমৎকার ব্যবহার। টকটকে রং, একমাথা বাদামী চুল, নীল চোখের তারা, মুখে মিষ্টি হাসি। কিন্তু বিপদ, তাকে কথা বোঝানো দায়। তাকে ইশারায় বোঝাতে হয় হাত মুখ নেড়ে; তবে

ভাগ্য ভালো, ছোকরা চালাক, তাই চট্ ক'রে বুঝে কাজটা ক'রে দেয় তক্ষুনি।

কিন্তু যাবার দিন পড়লাম মুস্কিলে। সকাল ন'টায় এথেন্স যাবার প্লেন। সাতটার মধ্যে সিটি অফিসে রিপোর্ট করবার কথা। কাজেই আগের দিন হোটেল-কর্তার হিসেব চুকিয়ে, হ্যাণ্ডশেক ক'রে, হাসি-হাসি মুখে বিদায় চেয়ে রেখেচি ; নিজের স্যুটকেশও গুছিয়ে রাখলাম। 'বয়'টিকে ডেকে হাতঘড়িতে ছ'টার দাগ দেখিয়ে ইশারায় বললাম, কাল সকালে ছ'টায় আমায় ডেকে দিয়ো। নিজে একবার নাক ডাকিয়ে ঘরের দরজায় আঙুলের দু'চার টোকা দিয়ে বুঝিয়ে বললাম, বৎসে, যদি ঘুমিয়ে থাকি, তবে দরজায় টোকা দিয়ে ডেকো যেন। নইলে প্লেন ফেল করতে হবে।

'বয়'টি একগাল মিষ্টি হেসে ঘাড় নেড়ে বোঝালো : ঠিক আছে, আমি ডেকে দেবো।

কিন্তু বিদেশে বেরিয়ে পরের মুখ চেয়ে থাকা ভুল। এই মূল্যবান জ্ঞানটুকু মগজে থাকায়, রাত্রে ঘুমটা একটু পাতলা ক'রেই রাখলাম। তাই আপনা থেকেই ঘুম ভেঙে গেল ভোর পাঁচটায়। প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে ছ'টা নাগাদ ব্যাগ হাতে ক'রে নীচে নেমে দেখি, যা বাব্বা, বয়টি এবং আরো দু'তিন জন তুর্কী ভিতরে সদর দরজার কাছে খাটিয়া পেতে দিব্যি নাসিকা গর্জনের কনসার্ট বাজাচ্চে!

কী সর্বনাশ! ঐ ছোকরার উপর নির্ভর করলেই তো হ'য়েছিল আর কি! মেজাজটা খিচড়ে গেল যেন। দাঁড়াও! বয়টার খাটিয়ার মাথার দিকটা ধ'রে উঁচু ক'রে সরিয়ে দিলাম বেশ খানিকটা সদর দরজার মুখ থেকে। দেখি, দোলা পেয়ে পকেট-সংস্করণের কুম্ভকর্ণ পাশ ফিরে আরো ভালো হ'য়ে শুলো।

সদর দরজার খিল খুললাম নিজেই। কাউকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে এলাম বাইরে। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়চে! মুস্কিল তো!

কিন্তু মুস্কিল আসান করলো একটি চলন্ত খালি ট্যাক্সি। তক্ষুণি তাকে ডেকে স-মাল উঠে বসলাম তাতে।

ট্যাক্সি হর্ণ বাজিয়ে রওনা হ'লো।

আর তুর্কী ক'জন তখনও তাদের খাটিয়ায় শুয়ে বাজাতে লাগলো নাসিকার হর্ণ।

ট্যাক্সিতে বসে ভাবছিলাম, সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে গেলে এমনি দুরবস্থাই হয়! দামী হোটেলে লোকে সাধ করে কি পয়সা দেয়?

যাক্। সিটি অফিসে ঠিক টাইম মতই পৌঁছুলাম।

ঘণ্টা দুই হাওয়ায় ভেসে নামলাম এসে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স সহরে। দূরত্বটা কম নয়, অথচ সময় লাগলো সামান্যই। যেন লোকাল ট্রেনে কলকাতা থেকে রাণাঘাট এলাম।

এথেন্সের এয়ার পোর্টে নেমেই কেন যেন এথেন্সকে ভালবেসে ফেললাম। এ জয়ান সমুদ্রের ধারে ফাঁকা পরিচ্ছন্ন পোর্ট। নীলাভা চারিদিকে। মাথার উপরে নীল আকাশ, অদূরে নীল সমুদ্র। পাশ্চাত্যের নীলাচল!

ইয়োরোপ নাকি নীল রক্তের দেশ। অন্ততঃ ইয়োরোপের অনেকেই তো তাই ভেবে গরব করে। তা' যদি হয়, তবে নীল-রক্তের দেশে যাবার সিংদরজা এই নীলাভূমি এথেন্স।

এথেন্স সহরে ঢোকবার মুখে চোখে পড়তে লাগলো শ্বেত-পাথরের স্থাপত্য-চিহ্ন। নীল আকাশের গায়ে সাদা পাথরের ভাঙা ভাঙা থাম-গুলি যেন ইতিহাসের থমকে-থামা শিল্প-সাক্ষী। আর কত না দেব-দেবীর মন্দির। এ পৃথিবীতে সবই নাকি ভঙুর! তাই ঐ ভাঙন হয়তো লজ্জার নয়। বরং এথেন্সের আধুনিক বাড়িগুলি ঐ মাথা-উঁচু-করা ভাঙা থামগুলির কাছেও বুঝি লজ্জানত। যেন বিরাট জমিদার-বাড়ির ভাঙা দেউড়ির গায়ে ঐ জমিদার বংশেরই কারোর টিনের চালাঘর।

শুধু তাই নয়, সেকালের ঐ ভগ্ন স্তম্ভ দেখিয়েই দম্ভ করচে এ যুগের এথেনিয়ানরা! দর্শনী আদায় করচে বিদেশী দর্শকদের কাছে।

এথেন্স সহরে সেকালীন ঐতিহ্য ও একালীন প্রগতি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। দাড়িওলা পাকা বুড়ো আর গোঁফ-না-ওঠা তরুণ গ্রীক যেন আড্ডা মারচে একসঙ্গে।

তাই অলিম্পিয়াম বা ডায়নিসস থিয়েটার, অথবা হেরোডেস এট্টিকস, কিংবা পার্থেনন, এক্রোপলিশ ইত্যাদির পায়ের কাছে বা গায়ের কাছে ঘেঁসা ঘেঁসি হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে এ যুগের টাউন হল, এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, কিং-জর্জ হোটেল, ন্যাশনাল গার্ডেন অথবা এট্টিকি রেল ষ্টেসন।

প্রবীণে নবীনে এমন দহরম মহরম খুব কম সহরেই দেখা যায়!

সিটি অফিসের কাছেই একটা হোটেল পাওয়া গেল। গ্রীক ভাষা বোঝার আশা ত্যাগ ক'রে ইশারায় কাজ সারতে হ'লো। স্যুট্‌কেশ দুটো সিটি অফিসে রেখে পা বাড়ালাম পথে। অনেকেই দেখতে লাগলো এই নতুন রংয়ের জীবটিকে। দেখবারই কথা। আমরা ইয়োরোপ যাবার পথে সোজা রোমে গিয়ে নামি, এথেন্স ঘুরে যাইনে। তাই আমাদের সঙ্গে গ্রীকদের পরিচয় খুব কমই। আর আলেকজাণ্ডারের যুগে যে পরিচয়টা হ'য়েছিল – সে তো কেবল রাজায় রাজায়।

পথের ম্যাপ একখানা পেলাম বটে সিটি অফিস থেকে—কিন্তু পথের নাম পড়াই দুষ্কর। সব গ্রীক ভাষায় লেখা। কথাও বোঝে না কেউ একবর্ণ।

সরু রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে দোকান-পাট। লোক চলাচলও মন্দ নয়। মেয়েরাই বাজার-হাট করচে। পরণে আধুনিক স্কার্ট কিংবা গাউন। সোনালী চুলগুলি ববড্‌ করা। তবে বেশির ভাগ মেয়েরই চুল বাঁধা পুরোন গ্রীক ধাঁচে—অর্থাৎ চুলের গোছা একটা রিংয়ের ভিতর দিয়ে পরিয়ে ঘোড়ার ল্যাজের মত ঝোলানো। মেয়েরা বুঝি আজ পর্যন্ত নতুন ফ্যাসান পেলো না খুঁজে! তাই আমাদের মেয়েদের 'এলো' খোঁপা ক্রমেই হ'লো দিদিমা-মার্কা পাটি-খোঁপা; আর ঐ গ্রীক তরুণী বব্‌ ছেড়ে ফের ঝুলালো তাদের ঠাকুমা-কালীন ঘোড়ার ল্যাজ।

গ্রীক-তরুণদের সেই হেলমেট, টিউনিক, ঢাল, বর্ম ছেড়ে এখন সার্ট-প্যান্টই ভরসা এবং সম্বল —আর পাঁচটা দেশের তরুণদেরই মত।

সরু রাস্তাটির মোড় ঘুরতেই হাতের কাছেই পেলাম এক গ্রীক-তরুণের দেখা। ছেলেটি ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত দিয়ে ; হয়তো তার প্রেম-পাত্রীর অপেক্ষায়।

তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম : এনি হোটেল হিয়ার ?

শুনে ঠোঁট উল্টে হাত ঘুরিয়ে বোঝালো, কিছুই বোঝেনি।

তখন অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হ'লো। হাতের উপর মাথাটা হেলিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে নাক ডেকে দিলাম একবার : অর্থাৎ ঘুমোবার জন্মে ঘর চাই। হোটেল

আমার এই 'বোবা কোড' দেখে গ্রীক ছোকরা হেসে ফেললো। সাগ্রহে আমার হাত ধ'রে সে টেনে নিয়ে চললো। বুঝলাম, বুঝেচে, কী চাই আমি।

সত্যিই বুঝেচে আমার বক্তব্য। কাছেই একটা হোটেলে নিয়ে গেল আমায়। দোতলায় দেখা হ'লো এক প্রৌঢ়া গ্রীক মহিলার সঙ্গে। থল্‌থলে, ঢলঢলে। মুখে হাসি। বাদামী চুলে খোঁপা বাঁধা। পরনে স্কার্ট। পায়ে স্লীপার।

গ্রীক তরুণ মাতৃভাষায় প্রৌঢ়াকে কী যেন বললো। প্রৌঢ়া সব শুনে ডাক দিলো যেন কাকে !

কাকে ? কে জানে !

চুপচাপ বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখা যাক, কেআ! সে দেখি একটু পরেই স্লীপার ঘসতে ঘসতে সামনে এলো এক গ্রীক তরুণী। যেন এক ঝলক আগুন! একটা জ্বলন্ত মশাল। গ্রীসের অলিম্পিকের মশাল নাকি! মেয়েটির হাতে একখানি বই ; তার ফাঁকে আঙুল দেওয়া। হয়তো শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল।

সোনালী চুলগুলি শ্বেত-মসৃণ কাঁধের 'পরে। নীল দু'টি চোখ।

গোলাপী গাল। রসালো পুরন্ত ঠোঁট। আঁট-সাট পোষাকে তনু-রেখা সুস্পষ্ট! বাহুলতার সবটুকুই অনাবৃত। উদ্ধত বক্ষ-যুগল বুঝি বহু চেষ্টায় বন্দী। কিন্তু জামার গলার সামনের দিকটা বড় বেশি রকমই খোলা। জামার কাট্ বুঝি শালীনতার ঠাট্টুকুও বজায় রাখতে চায় না। আমার প্রাচ্য চোখদুটো আর ঐ পাশ্চাত্য সৌন্দর্য সহ্য করতে পারলো না। চোখ ফিরিয়ে নিলাম লজ্জায়।

প্রৌঢ়া হয়তো তরুণীর মা। আর এঁরাই বোধকরি হোটেলের মালিকা। এ কালের মেয়ে। দু'চারটে বিদেশী ভাষা জানা থাকতে পারে। সেই ভেবে মা তাঁর মেয়েকে আমার আগমণের কারণ জানাতেই তরুণী বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে জিগ্যেস করলো : ইউ প্লীজ ইজিপ্সিয়ান?

আমার গায়ের রং দেখেই বুঝি তরুণীর ঐ ধরণের প্রশ্ন। হেসে বললাম, নো, ইণ্ডিয়ান।

ইন্দিয়ান! —এবার তরুণী হাসলো : আই রেদ্ এবাউৎ ইন্দিয়া। তাজমহল, বুদ্ধা।

বললাম, ধন্যবাদ। —মনে মনে বললাম, আমার বক্তব্যটা এখন তোমার মাকে বোঝাও তো! ঘরের একটা ব্যবস্থা হোক।

তরুণী মনের কথা বুঝলো নাকি? তার মাকে কি যেন বললো। মা-মেয়েতে কথাও চললো খানিকটা। অবশ্য কিছুই বোঝা গেল না। সবই যে 'গ্রীক টু মি'!

মার সঙ্গে কথা শেষ ক'রে তরুণী বললো আমায় : ঘর খালি আছে একটা। ভাড়া দৈনিক ২৫০০০ ড্রাকমা। খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

বললাম, তাই সই।

কিন্তু মনে-মনে ২৫,০০০ কে ৬৫০০ দিয়ে ভাগ দিয়ে নিলাম কারন আমাদের এক টাকা মানে গ্রীসে ৬৫০০ ড্রাকমা। নাঃ, এমন

কিছু নয়। চারটাকারও কিছু কম।

বললাম, ঘরটা দেখতে পারি?

সার্তেনলি! মেয়েটি বললো।

আমি গ্রীক তরুণকে ধন্যবাদ জানিয়ে, তার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলাম। তাকে বিদায় দিয়ে মা মেয়ের সঙ্গ নিলাম ঘরটা দেখতে। ছোট ঘর। সিঙ্গল বেড। স্প্রিংয়ের খাট। গদি পাতা। পায়ের কাছে পাপোষ। টেবিল-চেয়ার পাতা। বেসিনের বদলে কলাই করা গামলা, কাঁচের কুঁজো আর গেলাস। তা মন্দ কি! চার টাকায় কি আর চারশো মজা পাওয়া যায়?

বললাম, পছন্দ হয়েছে ঘর*

তরুণী বললো, থ্যাংকু। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে সব এখুনি বদলে দিচ্চি। জলও রেখে দেবো জগে।

বললাম, ধন্যবাদ। আমার স্যুট্‌কেশ দু'টো আনিগে। আর, তোমাদের ঠিকানাটা দাও আমাকে লিখে।

তরুণী ঘর থেকে একখানা ছাপানো কার্ড এনে আমার হাতে দিলো। গ্রীক, ফরাসী আর ইংরেজী ভাষায় লেখা: হোটেল ভিরো। ৩৮, রু এলু। এথেন্স (গ্রীস)

সিটি অফিসে এসে কিছু টাকাও ভাঙিয়ে নিলাম। দু'পাউণ্ডের একখানা ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাতেই হাতে এলো এক গাদা নোট—হরেকরকম সাইজের, নানা রংয়ে ছাপানো। প্রায় ১৭০০০০—এক লক্ষ সত্তর হাজার ড্রাকমা। মানে, রাতারাতি নয়, কয়েক মিনিটেই ব'নে গেলাম লাখোপতি। নোটে কোটের ভিতরের পকেট উঁচু হ'য়ে গেল। পোর্টারের হাতে স্যুট্‌কেশ দিয়ে বুক ফুলিয়ে হোটেলে ফিরলাম।

আবার বেরিয়ে খুঁজে-পেতে একটা রেষ্টুরেণ্টে ঢুকলাম। রেষ্টুরেণ্ট খুঁজে বার করা শক্ত নয়। কাঁচের জানলায় নানারকমের খাবার

সাজানো। ভিতরে চেয়ার টেবিল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খাবার গুলির রং দেখে বেশ বোঝা গেল, আমাদের দেশের মতই ওগুলি মশলা-চর্চিত। তবে কোনটি মাংসের এবং কোনটি না-মাংসের সেটা একটু দেখে নেওয়া দরকার। কারণ গ্রীকদের আবার গো শুকর কিছুতেই তো আপত্তি নেই! তাছাড়া ভেড়া-ছাগল-মুর্গীও আমার কাছে অচল। ঐসব পশু-পক্ষীর জন্যে আমার মুখ-গহ্বরের Road closed.

তবে ভাগ্য ভালো, আমার সুপরিচিত খাদ্যবস্তুরও দেখা পেলাম এই সুদূর দেশে। দোকানীর কাছে গিয়ে আঙুল দিয়ে দেখালাম—এটা দাও, ওটা দাও। টেবিলে এলো টমেটো সস্ দেওয়া ভাত, টমেটোর মধ্যে ভাত ও মশলা দিয়ে এক রকমের রান্না আর আলুর ঝাল। কাঁটা চামচের সাহায্যে সেগুলি ভয়ে ভয়েই মুখে ভরলাম। নাঃ, ভালোই লাগলো খেতে।

খাওয়া শেষ হ'লে পকেট থেকে কাগজ-পেনসিল বার ক'রে বয়কে ইশারায় বললাম, লেখো, কত হ'লো।

বয় হেসে হিসাব ক'রে দিলো কাগজে। পকেট থেকে ঝড়াক করে নোটের তাড়া বার ক'রে গুনে দিলাম ১০০০ ড্রাকমার ১১ খানা নোট—১১,০০০ ড্রাকমা। আমাদের প্রায় এক টাকা বারো আনা। বয়কেও দিলাম একটা হাজার টাকার নোট! টিপস্, বকশিস। বললো, এফারিস্তো। ধন্যবাদ।

হোটেলে ফিরে এসে দেখি, ঘর গোছানো হ'য়ে গেচে। বিছানায় ধবধবে চাদর পাতা, বালিশে ওয়াড় পরানো, আলনায় পাটকরা টার্কিশ তোয়ালে, কাঁচের কুঁজো ভর্তি জল আর গেলাস একটা।

মেয়েটি আমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালো: সব ঠিক আছে তো?

হেসে বললাম. নতুন শেখা কথাটি: এফারিস্তো।

শুনে হেসে ফেললো তরুণী: ইউ হ্যাভ লার্ণড গ্রীক—ইন ওয়ান

আওয়ার! অ'ৱাইত্‌—বলেই ছুটে গেল নিজের ঘরে। নিয়ে এলো একখানা পাতলা বই: ইউ তেক্‌ দিস্‌, রিদ্‌ দিস্‌। গ্রীক-ইংলিশ ওয়ার্দস্‌। আই স্পিক ইংলিশ ফ্রম দিস্‌ বুক্‌।

আবার হেসে বললাম, এফারিস্তো।

এথেন্স সহরে ঢুকলেই প্রথমেই যা চোখে পড়ে—উঁচু পাহাড়ের উপরে এক্রোপলিস। এক্রো, মানে উঁচু; পলিস, মানে নগর। পাহাড়ের উপরে এই উঁচু নগরই পুরাকালের এথেন্স। পরে পাহাড়ের আশে পাশে জনবসতি হওয়ায় আজ এথেন্স বিরাট সহরে পরিণত। এক্রোপলিস ভগ্ন জীর্ণ অবস্থায় আজও যেন পাহারা দিচ্চে, নতুন-গড়া এথেন্স নগরীকে। বুড়ো ঠাকুর্দা যেন বাড়িতে বসে আগলাচ্চেন বাড়ির কচি-কাঁচাদের। এথেন্স গেলে এক্রোপলিস্‌ চোখে পড়বেই আর এক্রোপলিস না দেখে এথেন্স দেখা, ভাবাও যায় না। এক্রোপলিস, এথেন্সের মাথার মুকুট। রাজদর্শনে, রাজার মুকুট তোমার চোখে পড়বে না? এক্রোপলিসের পার্থেনন, কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসের সম্মুখভাগের মত দেখতে, আয়তনে প্রায় দ্বিগুন—(ঠিক কথায়, পার্থেননের ডিজাইনেই সেনেট হাউসের সম্মুখভাগ তৈরী)।

এথেন্স থেকে সমুদ্র প্রায় চার মাইল দূরে এবং সেকালে পাইরেডস ছিল এর প্রধান বন্দর। এক্রোপলিসের উপর, সেকালের এথেন্স সহর ছিল চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, আজও তার ভগ্নাবশেষ চোখে পড়লো। এক্রোপলিসের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে পাথুরে ঢিপি—নিক্স (Pnyx); এখানেই 'বেমা' বা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তারা দিতেন বক্তৃতা। তার গায়েই আরেস (Ares) পাহাড় —বিচার-স্থান।

এক্রোপলিসে ঢুকতে হয় পাঁচ-দরজার স্তম্ভ-সজ্জিত বিরাট অট্টালিকা 'প্রপিলন'-এর ভিতর দিয়ে। কিন্তু, তার আগে উঠতে হবে মার্বেল পাথরের সাদা সিঁড়ি দিয়ে। রোমান যুগে আরো নতুন সিঁড়ি

যোগ করা হয়েচে—কিন্তু আসল গ্রীক সিঁড়ির থেকে রোমান সিঁড়ির পার্থক্য বোঝা যায় পাথর জুড়বার দাগ দেখে। কাজও মোটা ধরণের। গ্রীক শিল্প-চাতুর্যের কাছে রোমানদেরও মাথা নত ক'রতে হ'য়েচে। আর খ্রীষ্ট জন্মাবার প্রায় সাড়ে-চারশো বছর আগে তৈরী ভাস্কর্যের কাছে বিংশ-শতাব্দীও বিস্ময়াবিষ্ট।

প্রপিলনের প্রায় গায়েই এথেনা নাইক-এর মন্দির। এখান থেকে সমুদ্রের দৃশ্য অতি মনোরম। শোনা যায়, থেয়ুসের পিতা এজিয়ুস এখান থেকে জাহাজে কালো পাল খাটানো দেখে মনের দুঃখে নীচেয় পাথরে লাফ দিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করেন। এ বিষয়ে একটা গল্প আছে। সে সময় এথেনিয়ানরা প্রতি বছরে সিনোসসে মিনোটাউর রাক্ষসের কাছে তরুণ-তরুণীদের পাঠাতো 'বলি' হিসাবে। থেস্যুউস গেছলেন সেই রাক্ষসকে হত্যা ক'রতে। যাবার সময় ব'লে গেছলেন এজিয়ুসকে যে, যদি বিজয়ী হ'য়ে ফিরি, আমার জাহাজে টাঙিয়ে দেবো সাদা রংয়ের পাল। হয়তো বিজয়-আনন্দে সে কথা ভুলে গেছলেন, কালো পালই ছিল টাঙানো—কাজেই সেই ভুলে থেসেয়ুস হারালেন তার স্নেহময় পিতাকে।

প্রপিলন দিয়ে ঢুকে আসতে হয় এক্রোপলিসের বিরাট প্রাঙ্গণে। সামনেই ৫৩ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি—এথেন প্রমাকোস-এর। মূর্তির চোখ ঝলসানো বিরাট হেলমেট-এর উপর সূর্যের কিরণ পড়লে, দূরে সমুদ্রে নাবিকরাও জানতে পারতো, এথেন্স আর বেশি দূরে নয়। এই প্রাঙ্গণে এখনো বহু গ্রীক বীরের ভগ্ন মূর্তি চোখে পড়ে। আর এখানেই ছিল সেই ট্রয় ধ্বংসকারী 'কাঠের ঘোড়া'র ব্রোঞ্জ মূর্তি—স্মৃতি রক্ষার জন্যে। কালের কৃপায়, সেটি এখন বিলুপ্ত।

এক্রোপলিসে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রাসাদ—এরেকথিয়াম। এখন রীতিমত ভগ্নাবস্থায়। তবু তার গায়ে গ্রীক-ভাস্কর্যের যে নমুনা দেখা যায়—অপূর্ব। সেযুগের গ্রীকরা যে শুধু বিরাট প্রাসাদ করতেই

জানতেন, তা নয়। হাতের কাজেও ছিলেন রীতিমত ওস্তাদ কারিকর। এরেকথিয়াম (Erechtheum)-এ জেয়ুস দেবতার পূজো হ'তো, কিন্তু পশুবলি হ'তো না—নাগরিকরা দিতেন পিঠে তৈরী ক'রে—পূজার নৈবেদ্য। এরেকথিয়ামের maidens porch বা কুমারী-অলিন্দ দেখবার জিনিষ। অলিন্দের ছাদের ভার মাথায় ব'য়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্রীক-তরুণীরা। সেযুগের মেয়েদের সাজ-সজ্জা এবং চুলের ধাঁচের চমৎকার নিদর্শন—এই তরুণী-মূর্তিগুলি। লণ্ডনে ইউষ্টন রোডে সেণ্ট-পাংক্রাস গির্জার দু'ধারে এই তরুণী-অলিন্দের হাস্যকর অনুকরণ চোখে পড়েছিল। লণ্ডনে গাড়ী-ঘোড়া ও জনতার মাঝে পাঁচের পথের ধারে ছাই রংয়ের বেলে পাথরে গড়া অলিন্দের তরুণীরা এথেন্সের সুউচ্চ এক্রোপলিসে নীল আকাশের গায়ে এরেকথিয়ামের অলিন্দের সেকেলে তরুণীদের কাছে রীতিমত নিস্প্রভ, করুণ। ব্যবসা-বুদ্ধি আর কূটবুদ্ধি বিশারদের কাছে শিল্প সৌন্দর্য অবশ্য আশা করাও অন্যায়। এরেকথিয়াম পরে খ্রীষ্টানদের গির্জা হিসাবে ব্যবহৃত হ'তো এবং তারও পরে তুর্কীরা যখন জয় করেছিল গ্রীস, তুর্কী-পাশার ছিল এটি রাজপ্রাসাদ।

পার্থেনন, এক্রোপলিসের বিশেষ দ্রষ্টব্য। এথেন দেবতার মন্দির, যীশু জন্মাবার প্রায় পাঁচশো বছর আগেকার তৈরী। অথচ ঐ বিরাট মন্দিরের ধাঁচ এ যুগেও পরম বিস্ময়ের। তাই লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা কলকাতার সেনেট হাউস পার্থেননের ধাঁচে তৈরী। পারস্য, নিজের দেশে সৌন্দর্যের পূজারী হ'য়েও, কেন যে গ্রীসের এই বিরাট-অপূর্ব মন্দিরটি ধ্বংস করবার চেষ্টা ক'রেছিল জানিনে। হয়তো, হিংসাই ছিল কারণ। পরে ঐ মন্দিরের ভাঙা পাথর দিয়েই গড়া হ'য়েছিল ইক্রোপলিসের উত্তরের প্রাচীর। পার্থেননের স্থাপত্যের ভার ছিল ইক্‌টিনাসের উপর। ভাস্কর্যের কাজ ক'রেছিলেন শিল্পী ফিডিয়াস। দশ বছর লেগেছিল মন্দিরটা গড়তে এবং আজও এটি পৃথিবীর মধ্যে একটি সর্বোৎকৃষ্ট দেব-মন্দির। চারিপাশে বিরাট স্তম্ভের সার, যেন

দম্ভভরে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু ক'রে। সামনের আটটি স্তম্ভের উপর নানা মূর্তি-খচিত ত্রিকোন আকারের প্রস্তর খণ্ড—যেন রাজমুকুট। ভিতরে 'সেল্‌লা' বা হলে পূর্ব মুখো হ'য়ে স্থাপিত ছিল কুমারী এথেন দেবীর ৪০ ফুট উঁচু কাঠের মূর্তি—সোনা এবং হাতির দাঁতে সুসজ্জিত। সেল্‌লা-র পেছনেই ছিল আসল পার্থেনন বা কুমারী-অন্দর। দেবীর ধন-রত্ন, নানা নৈবেদ্য সাজানো থাকতো এই ঘরেই।

পার্থেননের দেব-সিংহাসনে বসবার সৌভাগ্য খ্রীষ্টান ও মুসলিম দুই অবতারই পেয়েছিলেন। ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পার্থেনন ছিল খ্রীষ্টানদের গীর্জা এবং পরে তুর্কীরা এথেন্স অধিকার করবার পর এটি হ'লো তাদের নামাজ পড়বার স্থান—মস্‌জিদ্‌। তুর্কীরা হয়তো কোরাণ এবং তলোয়ারকে সমান মর্যাদা দিত, তাই ঐ পার্থেননের মস্‌জিদের কাছেই রেখেছিল গোলা বারুদ মজুদ ক'রে। পরে ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেনিসরা যখন এথেন্স আক্রমণ করেছিল, তাদের কামানের একটি গোলা এসে প'ড়েছিল তুর্কীদের জমানো গোলা বারুদের উপর এবং তারপর যা হয়, তাই হ'লো। পার্থেননের খানিক অংশ ভেঙে তার নক্সা করা পাথর, স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ ছড়িয়ে প'ড়লো চারদিকে। পরে তুর্কীরা ঐসব ভগ্নরাশির মধ্যে দরকার মত গ লো ছোট ছোট ঘর। বিরাট শ্বেত-পাথরের মন্দিরের আংশিক ভগ্নস্তূপের মধ্যে সেই ছোট ছোট তুর্কী ঘরগুলি কী সকরুণ ছিল, তা আজও যেন আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাই।

তুর্কীতে ব্রিটিশ দূত ছিলেন তখন লর্ড এলগিন। তিনি দেখলেন, পার্থেননের ভগ্নস্তূপের মধ্যে রয়েচে অপূর্ব গ্রীক ভাস্কর্যের নিদর্শন। তিনি তুর্কী সরকারের কাছে অনুমতি চাইলেন, ঐ ভগ্নস্তূপগুলির জন্যে। তুর্কী সরকার এককথায় রাজী হ'লেন, হয়তো হেসেওছিলেন মনে মনে, লোকটা পাগল নাকি? আর হয়তো ভেবেছিলেন, যাক্‌, জায়গাটা পরিষ্কার হবে ব্রিটিশের টাকায়। কাজেই ঘর তোলার

জায়গা পাওয়া যাবে আরো। সংস্কার-বিলাসী ইংরেজ আর দেরী না ক'রে সেই পাথরের ভগ্নস্তূপগুলি সযত্নে জাহাজে ক'রে পাঠালেন লণ্ডনে। আজো সেগুলি পরম আদরে সাজানো রয়েচে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে 'এলগিন-রুমে'। সংস্কার-বিলাসী পাগল ইংরেজটির জন্যে আজকের জগৎবাসী দেখতে পায় সেযুগের গ্রীক-ভাস্কর্যের নিদর্শন এবং হোমার, সফোক্লিস, এরিষ্টটলের প্রতিমূর্তি।

এখন এক্রোপলিসে কেউ থাকে না। অন্ধকার রাত্রে গ্রীক-শিল্পের প্রেতাত্মার মত দাঁড়িয়ে থাকে শ্বেত-পাথরের ভাঙা মন্দিরগুলি। চেয়ে দেখে তারা, এক্রোপলিসের চারধারে নতুন এথেন্সের বিজলী আলোর সহর। দিনে এক্রোপলিসে আসে অনেকেই ক্যামেরা কাঁধে ক'রে, কেউ বা মেয়ে-বান্ধবীকে কনুয়ে জড়িয়ে। প্রপিলনের সিংদরজার বাইরে বসে গ্রীক দোকানীরা ছোট ছোট পাথরের মূর্তি নিয়ে, গ্রীসের ছবি নিয়ে, নানারকমের সৌখিন জিনিষ নিয়ে। ক্যামেরা কাঁধে লোক দেখলেই বোঝে, লোকটা টুরিষ্ট। ভাঙা ইংরেজীতে দোকানদারি শুরু ক'রে দেয়। সন্ধ্যে হ'লেই তারা দোকান-পাট গুছিয়ে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে নামে সহরে। পূর্ণিমা রাতে এক্রোপলিসে দেখা দেয় নতুন রূপ—রহস্যভরা। চাঁদের রূপালী আলো এসে পড়ে শ্বেত-পাথরের ভগ্ন মন্দিরের উপর। হয়তো হাসে আর বলে, পার্থেনন, আমি পূর্ণাঙ্গ হ'য়েই দেখা দিই নিয়মমত, কিন্তু তুমি সেই যে ভেঙে প'ড়লে, আজও পারলে না পূর্ণাঙ্গ হ'তে। পার্থেনন হয়তো উত্তর দেয়, তাতে আমার দুঃখ নেই ভাই; আমার নাতি-নাতনীরা তবু যে সময় ক'রে এই বুড়োটাকে দেখে যায়, তাতেই আমি খুশী। তা' আসে গ্রীক তরুণ-তরুণীরা এক্রোপলিসে। চাঁদনী রাতে পার্থেননের সিঁড়িতে ব'সে থাকে গ্রীক তরুণ-তরুণীরা, এ-ওর কাঁধে মাথা রেখে। অদূরে সমুদ্রের হাওয়া বইতে থাকে হু হু ক'রে। পার্থেননের হারানো যৌবনের দীর্ঘশ্বাস নাকি?

সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। এক্রোপলিসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখলাম,

সূর্যাস্ত। নীল গ্রীক আকাশের শেষে লাল সূর্য ডুবতে লাগলো আস্তে আস্তে। পার্থেননের সাদা পাথরে লালের আভা। আমি এসেচি আলেজাণ্ডারের দেশে, সক্রেটিস, প্লেটো, আরিষ্টটলের দেশে, একদা বিরাট সভ্যতার দেশে, যার নিদর্শনটুকু প'ড়ে আছে এক্রোপলিসের ভাঙা পাথরে আর বাকিটুকু ইতিহাসের পাতায়। গ্রীক গগণের মধ্যসূর্য আজ অস্ত-যাওয়া ঐ লজ্জা-রাঙা সূর্যে বুঝি পরিণত।

গ্রীক মিউজিয়াম ঘুরে এবং গ্রীক-ইতিহাস ঢুঁড়ে পুরোন গ্রীসের বিষয়ে যা জানতে পেরেচি, তা নতুন করে বললে মন্দ লাগবে না হয়তো। গ্রীসের সেই 'সোনার খাঁচার দিনগুলি' আর রইলো না, তবে তার কাহিনীগুলি আজো বেঁচে আছে এই লৌহ খাঁচার মানুষগুলির মনের কোঠায়। যখন মনে পড়ে, হায়-হায় করে মন।

এখনকার গ্রীক বাজার, কলকাতার বাজারের মতই। থলে হাতে, পয়সা ট্যাঁকে বাজারে যাও, ফর্দ দেখে বাজার ক'রে পারো তো, বগলে একখানা খবর কাগজ চেপে নিয়ে বাড়ি এসো। কিন্তু সেযুগের গ্রীক বাজারে যেমন কেনা-কাটা চলতো, তেমনি সেই সঙ্গে চলতো খবর চালাচালি। খবরের কাগজ ব'লে তখন কিছুই ছিল না; লোকে জড়ো হ'তো বাজারে, শুনতো এর-ওর কাছে নতুন-নতুন খবর। মুখে-মুখে ছড়ানো খবর অতিরঞ্জিত হ'তো বৈকি! বেড়াল হয়তো দশম ব্যক্তির কানে বাঘ হ'য়ে ঢুকতো। বাঃ, এযুগেও তা হয় না বুঝি! ছাপা খবরের কাগজও তো তাক বুঝে কোথাও ফেনিয়ে লেখে, কোথাও বা স্রেফ চেপে যায়। হ্যাঁ, বাজারে চাষীরা আনতো তরি-তরকারি, ফলমুল—যেমন আজো আনে এবং সাধারণ লোকেরা আসতো কিনতে আর আসতো বড়লোকের বাড়ির দাসেরা। মেয়েরা মর্দানি ক'রে বাজারে আসতো না সে যুগে।

হোমারের 'ইলিয়াড'এ জানা যায় বটে, সে যুগেও ছিল গ্রীক-

ডাক্তার। কিন্তু হেরোডোটাস লিখেচেন, ডাক্তার অভাবে এমনও দেখা গেচে যে রোগীকে বয়ে আনা হয়েচে বাজারে বা পার্কে—যাতে কোন লোক হয়তো রোগের কথা শুনে বলতে পারে, ওহো আমরাও তো হয়েছিল এই একই অসুখ অমুক সালে, শেষে অনেক ভোগবার পর অমুক ওষুধে রক্ষে পাই। কিংবা, কেউ হয়তো বলতো, আরে এ অসুখ তো আমার খুড়তুতো ভাইয়ের জাঠতুতো শালীর মেজ দেওরের হয়েছিল—কোন কিছুতেই সারে না, শেষে, বুঝলে কিনা—মানে আমিই—

এবং শেষপর্যন্ত ঐ রোগীকেও সেই লোকটির বাৎলানো ওষুধ দেওয়া হতো। ভোগ থাকলে ভুগতেই হতো বা সংসার থেকে ভাগতে হতো তার ওষুধে। আর ভাগ্য ভাল থাকলে সেরে যেতো রোগী। অর্থাৎ সে যুগের রোগীরা হরেক ডাক্তারের সুঁচের ঘায়ে বেঘোরে প্রাণ হারাতো না বটে, তবে হাতুড়ে ডাক্তারের হাতুড়ির ঘায়ে হয় মরতো, না হয় চাঙা হ,য়ে উঠতো। আবার রোগ সারাবার জন্যে আমাদের দেশে মন্দিরে হত্তে দেবার মত সে যুগের অনেক রোগীরা এসক্লিপিউসের মন্দিরে এসে বলি দেওয়া ভেড়ার চামড়ার ওপর শুয়ে দিনের পর দিন হত্তে দিতো, যতদিন না পেতো স্বপ্নাদেশ : যা ব্যাটা তোর সেরে যাবে।

তবে যীশু জন্মাবার প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে গ্রীক বৈদ্য-বিদ্যায় হিপোক্রেট্স-এর নাম শোনা যায়। তিনি আজকালকার ডাক্তারদের মতই প্রাকটিস করতেন। রোগীর বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করতেন, ভিজিট নিতেন। তবে সেকালে ডাক্তার হতে হ'লে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা করতে হ'তো, এবং সে সময়ে ইয়োরোপেও নানা দেশে এই প্রথারই চলন ছিল, এখন নেই কেন জানিনে। থাকলে লাভ ছিল বই ক্ষতি ছিল না। ডাক্তারকে প্রতিজ্ঞা করতে হ'তো :

(১) আমি এপোলো, এসক্লিপিউস ও অন্যান্য দেব দেবীকে সাক্ষী

রেখে শপথ করছি, জনস্বাস্থ্যের কল্যাণে চিকিৎসার ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। (২) আমার শিক্ষাগুরু আমার পিতার ন্যায়। তিনি অর্থাভাবে পড়লে সাহায্য করবো, তাঁর পুত্রদের যদি কেউ এই বৈদ্যবিদ্যা শিখতে চায়, তাকে বিনা দ্বিধায় শিক্ষাদান করবো। (৩) আমি কখনো কাউকে বিষ প্রয়োগ করবো না ; কেউ চাইলেও না, (৪) কারোর দেহে বেআইনি অস্ত্রপ্রয়োগও করবো না। (৫) কোনো বাড়িতে চিকিৎসার ব্যাপারে গিয়ে সেখানে কোন রকম অভদ্র বা অন্যায় আচরণ করবো না। (৬) চিকিৎসা ব্যাপারে কোন পরিবারের কোন গোপনীয় তথ্য প্রকাশ পেলে আমার কাছে সে তথ্য আজীবন গোপনীয় হয়েই থাকবে।

আধুনিক বৈদ্যদেরও দরকার, এই প্রতিজ্ঞাগুলির। কিন্তু সেই সঙ্গে দরকার ধর্ম-ভয়। কিন্তু এযুগে ধর্ম-ভয়ের অভাব যখন, তখন প্রতিজ্ঞাগুলি নিতান্তই অর্থহীন, তাই হয়তো অচল।

গ্রীসের একটি মস্ত দান, থিয়েটার। 'ড্রামা' কথাটি গ্রীক কথা। মানে, কিছু করা—যাতে মানুষের জীবন-কাহিনী ব্যক্ত করা যায়। অভিনয় বলতে সেকালে গ্রীসে উর্বরতা ও দ্রাক্ষা-দেবতা ডাইয়ে-নিসাসের পুজো উপলক্ষে ছাগল-নাচ হ'তো মন্দিরের সামনে এবং পরে সেই ছাগলটিকে দেওয়া হতো বলি। 'ছাগলে কি না খায়' সে কথা গ্রীকদেরও জানা ছিল বুঝি এবং একবার কোন চারা গাছে মুখ দিলে আর যে সে চারার কোন আশা নেই, তাও তাঁদের অজানা ছিল না—তাই হয়তো এই সর্বনাশা জীবটির বলির ব্যবস্থা। এবং গ্রীক ভাষায় ছাগলকে বলা হয় 'ট্রাজেডী'! আজ আমাদের কাছে রঙ্গমঞ্চে 'ট্রাজেডী' মানে বিয়োগান্ত নাটক।

কিছু পরে থেসপিস গ্রীক রঙ্গমঞ্চে দু'জন লোকের কথাবার্তা দিয়ে অভিনয় চালু করেন। এই সময়ে ফ্রাইনিকুস (Phrynichus)

এথেন্সে 'মিলেটুস'অবরোধ' (Capture of Miletus) নামে এক অভিনয়ের ব্যবস্থা করে ফ্যাসাদে পড়ে গেছলেন। সে অভিনয় দেখে দর্শকরা কেঁদে ফেলেছিল, তাই নাট্যকারকে দিতে হয়েছিল এক হাজার ড্রাকমা জরিমানা।

তার পর নাম করতে হয় 'বন্দী প্রমেথিয়ুস' ড্রামার এসকিলাস (Æschylus)-এর। তিনি রঙ্গমঞ্চে সমবেত সঙ্গীতের ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে আমাদানি করেছিলেন কথার প্রাধান্য। এর পর আসেন সফোক্লিস তাঁর 'এন্টিগন' (Antigone) নিয়ে এবং নাটকে তৃতীয় চরিত্রের সৃষ্টি করেন। এই ড্রামাটিতে পেরিক্লিসের সময়কার সমাজ-চিত্র চমৎকার পরিস্ফুট।

পুরোন আমলে গ্রীসে এই সব অভিনয় হ'তো দিনের বেলায় খোলা জায়গায়। মাঝখানে গোল জায়গাতে হ'তো নাচ অর্থাৎ গ্রীক ভাষায় অর্কেষ্ট্রা এবং তার সামনে পাশে অর্ধ গোলাকারে ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে থাকতো দর্শকদের বসবার আসন। আগে তাও ছিল না, কোন ঢালু জায়গায় ঘাসের উপর দর্শকরা বসতো। পরে চতুর্থ শতাব্দীতে এথেন্সে ডাইনিসুস থিয়েটারে প্রথম পাথরের আসন তৈরি হয় দর্শকদের জন্যে।

ডাইনিসুস থিয়েটারে আজো গ্রীকরা আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে—তবে দিনের সূর্যকে সাক্ষী রেখে নয়, বিজ্‌লী বাতি জ্বেলে রাত্রে, যা সেদিনের গ্রীকরা ভাবতেও পারেনি। দেখলাম সে থিয়েটার, ঘুরে বেড়ালাম আসনগুলির ওপর, ষ্টেজের ওপর। কদিন পরেই ওখানে একটা কনসার্ট হবার কথা, কাজেই লোকেরা ফ্লাশ লাইটের ব্যবস্থায় ব্যস্ত।

যেখানটায় অভিনয় হ'তো, তার পেছনে থাকতো ৫।৬ মানুষ উঁচু প্রাচীর। তাই বোধহয়, খোলা জায়গাতেও শেষ আসনে-বসা দর্শকদেরও পক্ষে অভিনয় দেখতে বা শুনতে অসুবিধা হ'তো

না। অনেক অভিনেতা মুখোস পরতেন—তার একদিকটায় রাগের ভাব, অন্য দিকটায়, আনন্দের। তাঁর অভিনয়ের বিষয় হিসাবে তিনি সেইভাবে মুখ ফেরাতেন দর্শকদের দিকে। সেকালের দর্শকরা তাই দেখে বা শুনেই কত খুশি! আর আজকাল? আমাদের খুশি করবার জন্যে প্রযোজক মশায়দের কম কাঠ খড় পোড়াতে হয়! তবু যেন নাক উঁচিয়েই আছি।

গ্রীকদের সেকেলে বাড়িগুলির—বিশেষ ক'রে মধ্যবিত্ত লোকেদের বাড়িগুলি বেশ বড়ই ছিল। অনেক বাড়ির সামনেটা ছিল সেনেট হাউসের ধাঁচে। বাড়িতে বাইরের ঘর, উঠোন, হলঘর, শোবার ঘর, রান্নাঘর, বারান্দা, দাস-দাসীর ঘর সবই থাকতো। অর্থাৎ, এযুগে এতরকম করেও যা আমাদের বাড়িতে নেই—সেযুগের গ্রীক বাড়িতে সে সবই ছিল। আসবাব পত্রেরও অভাব ছিল না। টেবিল চেয়ার, তেপায়া ছোট টেবিল, কোচ—ছিল সবই। আর ছিল Vase (ভাস), ছোট ছোট ফুলদানীর মত—কারুকার্য করা। সেকালে গ্রীকরা কোচের ওপর আধশোয়া হ'য়ে বাঁ কনুয়ে ভর দিয়ে ডান হাতের কাজ সারতেন, আবার খাবার পর সেই কোচেই ঘুমুতেন। বাইরের কাজ করতেন পুরুষরাই, মেয়েরা করতেন ঘরের কাজ। গ্রীক গৃহিণী ঘর গুছোতেন, ছেলে মানুষ করতেন, হাতের কাজ করতেন—পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অফিস করতে যেতেন না। পুরুষের কাজ ছিল পুরুষালি, যুদ্ধ করা, চাষ করা, ব্যবসা করা, জাহাজ চালানো ইত্যাদি; ছেলের জন্যে দুধ জ্বাল দেওয়া গ্রীক পুরুষ ভাবতেও পারেননি। তাঁদের শক্ত পেশী ছিল শক্ত পেশার জন্যে।

গ্রীক ষোড়শীকে বাপের বাড়ি ছাড়তে হতো একটু আগে আগেই। বিয়ের আগের দিন আর্মেটিস দেব মন্দিরে গিয়ে দিয়ে আসতে হ'তো তার খেলার পুতুলগুলিকে। বিয়ের দিন গোধুলি লগনে বর

আসতো কণের বাড়িতে বিয়ে করতে এবং তাকে সেই রাত্রেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতো নিজের ডেরায়। সেখানে শ্বশুর-শাশুড়ি এসে করতেন বধূ-বরণ। তারপর আত্মীয় স্বজন সবাইয়ের সঙ্গে বর যেতো কণের হাত ধরে দেবমন্দিরে দেবদেবীর আশীষের আশায়। সেখানে নানা শস্যে ফলে ফুলে তাদের অভ্যর্থনা জানানো হতো। পরদিন বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনরা আসতেন বিবাহ ভোজে উপহার সামগ্রী হাতে ক'রে।

সেকেলে গ্রীকরা আমোদ-প্রমোদ করতেও জানতেন। বাঁশী, হার্প ছিল তাঁদের অতিপ্রিয় বাজনা। দোলনায় চড়তো ছেলেরা, মেয়েরা নাচতো অতিথি অভ্যাগতরা সমাগত হলে বাড়িতে। দুষ্টু ছেলে-মেয়েও ছিল। কচ্ছপের একপায়ে দড়ি বেঁধে কুকুরের মুখের সামনে ঝুলিয়ে কুকুর নাচাতো। হকি খেলা গ্রীকরাই প্রথমে প্রচলন করেন। পাখী পোষবার সখও ছিল তাঁদের। তবে তাঁরা পাখীদের কিং বুলি শেখাতেন জানিনে,—'রাধা-কৃষ্ণ'র মতই কিছু হবে হয়তো। কবরখানার মধ্যে খরগোসের পেছনে ছুটোছুটি খেলাও ছিল তাদের কাছে এক আনন্দদায়ক অবসরযাপন। দু'হাতের উপর ভর দিয়ে পা উঁচু ক'রে 'পিকক্' হওয়া—শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও জানতো। তাছাড়া বিশ্ববিখ্যাত অলিম্পিক খেলা গ্রীকরাই তো প্রথমে শুরু করেন, যদিও প্রথম বছরেই শুধু তাঁরা বিজয়ী হন ; পরে অন্য জাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর পারেন নি। প্রথম বছরে, অল্প দেশই এই খেলায় অংশ গ্রহণ করায় বুঝি ভাগ্যে 'শিকে ছিঁড়ে' পড়েছিল বিজয় মাল্য তাঁদের গলায়।

গ্রীকদের যুদ্ধের কথা, এই যুদ্ধভীত অধমের কাছে না শোনাই ভালো। তবে কী ধরণের অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করতেন তাঁরা, তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদ, বর্শা ফলক, শিরস্ত্রান ইত্যাদি আমাদের অদেখা নয় ছবির কৃপায়! অতএব অলমতি বিস্তারেণ।

গ্রীসে একটা গল্প শুনলাম। ওরা বলে, ঈশ্বর যখন এই পৃথিবী তৈরি করবার জন্মে চালনী দিয়ে মাটি চালছিলেন—তখন চালনীর তলাকার ভালো মাটি তিনি নানা দেশে ফেলেছিলেন আর চালনীর উপরের কাঁকরগুলো ফেলেছিলেন এই গ্রীসে। এটা রূপকথা হ'লেও, মিথ্যে কথা নয়। দেশটা পাহাড় দিয়ে তৈরি, আর মাটি সত্যিই পাথুরে। তবে কালের জল হাওয়ায় পলি মাটি পড়ায় কোথাও কোথাও চাষের মাটিও দেখা যে যায় না তা নয়! কাঁকরের সঙ্গে মাটির আঠাও ঈশ্বর দিয়েছিলেন বৈকি কিছুটা—নইলে সমুদ্রের ঢেউ সব কাঁকর ধুয়ে নিয়ে গ্রাস করতো গ্রীসকে। তবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়তো, বৃষ্টির জলধারা গ্রীসের পাহাড়ে পড়েই হুড়-হুড় করে সমুদ্রে না গিয়ে—পাহাড়ের কোলে কোলে কিছু দিন নিঝুম হয়ে থাকে—তারপর যখন আস্তে আস্তে থিতিয়ে পড়ে সেখানে, তখন দেখা যায় নানারাজ্যের ধুলো, বালি, কাদা আর বনের পাতা এনেচে কোচরে ক'রে। গ্রীস এমনি করেই উর্বর হয়। ঈশ্বর এই ব্যবস্থা করেছিলেন, তাই গ্রীক এক হাতে পাথরে যেমন তলোয়ার শানিয়েচে, অন্যহাতে তেমনি লাঙল চষেচে মাটিতে।

সমুদ্রে হুমড়ি খেয়ে পড়া গ্রীসের সৌন্দর্য মনোরম। আবহাওয়াও আমাদের দেশেরই মত, শীত-গরমে মিশানো। যব বা গম তত ভাল হয় না গ্রাসের মাটিতে—কিন্তু অলিভ গাছ আর দ্রাক্ষা কুঞ্জ বহুৎ। পেলোপনী অঞ্চলে বাড়তি ফলে কমলা লেবু, ডুমুর, ভুট্টা, বার্লি। থেস্যালিও গ্রীসের আর একটি খাদ্যভাণ্ডার। তবে এটা সত্যি, ঈশ্বর গ্রীকদের জন্যে মাটির তলায় কিছুই লুকিয়ে রাখেননি। মাত্র এট্টিকাতে কিছু শিসে পাওয়া যায় আর নাক্সস দ্বীপে সামান্য বাদামী কয়লা। সেজন্যেও গ্রীকদের দুঃখ। বলে, আমাদের গ্রীস আর দারিদ্র্য—দুটি একই মায়ের পেটের বোন।

গ্রীসে লোকবলও তেমন নেই। গত লড়াইয়ের আগে আদম সুমারীতে জানা গেচে সারা গ্রীসে মাত্র সত্তর লক্ষ লোক। অথচ খবর নিয়ে জানলাম, গ্রীস বলতে ১৩০,০০০ বর্গ কিলো-মিটার। দেশটায় অর্ধেকেরও কম জমিতে ফসল ফলে, কাজেই খাদ্যভাব রীতিমত। মাঠে ঘাস নেই, তাই গরু দেখা যায় না বড়। ভেড়া ছাগলের চলনই বেশি। ভেড়া-ছাগলের দুধ খেয়েই মানুষ হয় গ্রীক-শিশু। মাখনের কাজ চালানো হয় অলিভ-তেলে। দ্রাক্ষাকুঞ্জ আছে তাই দ্রাক্ষারসটি সহজ প্রাপ্য। তাই মন-মেজাজ চাঙা রাখতে দ্রাক্ষারসই গ্রীক-পাণীয়। ঐ পাণীয় এবং আঙুর শুকিয়ে কিসমিস ক'রে টনটন পাঠিয়ে থাকে দেশের বাইরে এবং বাইরে থেকে গ্রীস ঘরে আনে টাকা। দক্ষিণে মধ্যসাগরের ধারে গ্রীসের মাটিতে কিছু কিছু পীচ, তরমুজ, বাদাম, চেরী, আপেল ফলে বটে—তবে তা বাইরে বার করবার মত নয়। সাইজে ছোট, ফলনও বেশি নয়। কাজেই ঐ ফলগুলি গ্রীক বাজারেই সাজানো হয়, ভর্তি হয় গ্রীকদের বাজারের থলিতে।

তবে বাইরে থেকে টাকা টানবার আর একটি বস্তু আছে গ্রীসের। তামাক। আলেকজাণ্ডার-বিখ্যাত ম্যাসিডোনিয়ার তামাক রূপে-গুনে বিখ্যাত। ঈজিপ্‌সিয়ান সিগ্রেটের তামাক নাকি গ্রীক-তামাক থেকেই তৈরি।

পাথুরে গ্রীসের আর একটি অসুবিধে—যাতায়াতের অবব্যস্থা। নদী বলতে কিছুই নেই - কাজেই নৌকো-ষ্টীমলঞ্চের কথাও ওঠে না। গাড়ি যাতায়াতের রাস্তা আছে বটে, তবে এত উঁচু-নীচু যে মোটর ছাড়া হেঁটে বা সাইকেলে যাওয়া গ্রীক-বাচ্চা পারে হয়তো কলজের জোরে—কিন্তু তোমার-আমার পক্ষে 'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও' বলে হাজার পিঠ চাপড়ালেও স্রেফ অসম্ভব। রেলপথও তেমন কিছু নয়। সব সিংগল লাইন। তাও পাহাড় এড়িয়ে ঘুরপাক

খেতে খেতে—নাক ঘুরিয়ে দেখাবার অবস্থা। মাঝে মাঝে পাহাড় এড়াতে না পেরে পাহাড় ফুঁড়েও যেতে হয়েচে। তবে নীল সমুদ্রের ধার দিয়ে এঁকে বেঁকে গাড়ি সারি নিয়ে ইঞ্জিনগুলো যখন 'কু ঘ্যাচ-ঘ্যাচ্' ক'রে সাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যায়—তখন দেখতে সত্যিই চমৎকার। গাড়ির মধ্যে যারা থাকে, তারাও ক্ষণে ক্ষণে রূপ গিলতে থাকে দু'চোখ দিয়ে।

রেল লাইনগুলোর মধ্যে নাম করবার মত দুটি মেনলাইন: প্রথমটি এথেন্স থেকে সালোনিকা পর্যন্ত, আর দ্বিতীয়টি এথেন্স থেকে ইয়োরোপমুখো যে লাইনটা গেছে যুগোশ্লাভিয়ার ভিতর দিয়ে। ট্রেনও খুব ঘন ঘন নেই। ইয়োরোপের দরজার কাছে থেকেও যাতায়াতের এ দারিদ্র্য গ্রীসের পক্ষে লজ্জার। কিন্তু উপায় নেই। গ্রীসে ইঞ্জিনিয়ার নেই বললেই হয়। বড় কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করতে গেলেই ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার দ্বারস্থ হতে হয় তাকে।

তাই গ্রীকরা এ-সহর ও-সহর যাতায়াত করে সমুদ্রপথে। সারা গ্রীসের সমুদ্রধারগুলোয় অগুন্তি জাহাজঘাটা। ছোট ছোট জাহাজগুলো লোক আর মাল বোঝাই ক'রে এ-ঘাটে ও-ঘাটে গিয়ে ঠেকচে, এ দৃশ্য সমুদ্রধারে গেলে চোখে পড়বেই। ঘাটের কাছে জল গভীর থাকায় গ্রীসের এই জাহাজী ব্যবস্থা সত্যিই উপকারী। এ কাজে লোক দরকার, তাই গ্রীসের ছেলেরা অনেকেই শেখে জাহাজ-চালনা। গ্রীক নাবিকের নাম আছে।

গ্রীসের গাঁয়ের দুরবস্থা আমাদের গাঁয়ের মতোই। ওদের উঁচু নীচু পাহাড়ের জন্যে ভাল পথ নেই—আমাদের গাঁয়ে প্যাচপেচে কাদার জন্যে পথ চলা ঝকমারি। জলের জন্যে গ্রীসের গাঁয়ে কুঁয়ো, তাও বহু দূরেদূরে, আর আমাদের গাঁয়ে নোংরা পুকুর আর নদীর

ঘোলা জল। ইলেক্‌ট্রিক আলো রেডিও গ্রীসের গেঁয়োদের ভাগ্যের আজো জোটেনি—আমাদের গেঁয়োদের মতই ভাগ্যহীন। আমাদের চাষীদের পান্তাভাত শাক চচ্চড়ির মত গ্রীসের চাষী খায় শুকনো রুটি আর ভেড়ার মাংস। অবশ্য সেই সঙ্গে বাড়তি পানীয় ঘরের তৈরি দ্রাক্ষাসব। তবে আমাদের কর্তারা যেমন উঠে পড়ে ড্যাম-ব্যারেজ গাঁথতে শুরু করেচেন তাতে অনেকেই আশার আলোক দেখচেন—হয়তো কিছুদিন পরে চাষীর খড়ের ঘরে বিজলি আলো দেখা দিতেও পারে। কিন্তু গ্রীসের হালফিল হাল ফিরবে বলে মনে হয় না। দেশটায় ভাল কয়লা নেই, লোহা নেই, পেট্রোল নেই। ইয়োরোপের হঠাৎ নবাবরা যদি পেছিয়ে পড়া গ্রীক-বুড়োটির দিকে না চেয়ে দেখে, তাহলে তাদের পায়ের কাছে যেমন প'ড়ে আছে—তেমনি থাকতে হবে হয়তো। তবে তারা নিজেরাই যেভাবে হাফ-আখড়াই শুরু করেচে—তাতে ওর উপর নজর দেবার সময় কোথায়? গত যুদ্ধের সময় হিটলারী-জার্মান তো এসে ভাল ক'রে জুতোর গুঁতো দিয়ে গেল। জনবুল অবশ্য শেষের দিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল গুণ্ডা জার্মানকে—কিন্তু কোমরে হাত দিয়ে মুরুব্বি চালে বলতেও ছাড়েনি: ওহে বুড়ো, দেখলে তো কেমন হটিয়ে দিলাম ওটাকে দু'ঠোক্করে? মনে থাকে যেন এ উপকার।

এ আমার গল্প নয়, এই সেদিনের ঘটনা। '৪৫ সালে ক্রিমিয়া কনফারেন্স থেকে হোমে ফেরবার পথে হঠাৎ একদিন এডেন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে চার্চিল সাহেব এথেন্সে এসে ইংরেজী ভদ্রতায় মিষ্টি করে গ্রীকদের বলেছিলেন:

I am sure, we rescued Athens from a horrible fate. I believe that the Greek people will long aclaim our action, both military & political. Peace without vengience has been achieved.

তবে সব দেশের ছোকরাদেরই রক্ত গরম—কাজেই মাথাও গরম। ওরা বায়না ধরেচে, সাইপ্রাস আমাদের ছিল, আমাদের দাও হে ইংরেজ। ইংরেজ ভাবচে দেশটা কী নেমকহারাম রে বাবা!

গ্রীসের গাঁয়ের সঙ্গে আমাদের মিল যেমন, গ্রীসের সাধারণ ঘরের হালচালের সঙ্গেও তেমনি আমাদের অমিল নেই। আমাদের আঁতুড়ে ছেলে হ'লে যেমন সাতবার শাঁখ বাজে আর মেয়ে হ'লে ঠোঁট ওল্টায় সবাই—গ্রীসেও প্রায় তেমনি অবস্থা। কারণও ঐ একই কারণ। মেয়ের বিয়েতে টাকা ঢালতে হয়, বরপণ। তবে গ্রীক ক'নের বাপ নগদ টাকা, গহনা আর বেশ কয়েক গজ থান কাপড় দিতে পারলে মেয়ে পার করতে পারে, এই যা। আমাদের মত বাড়তি ব্যবস্থা—ঘড়ি-বোতাম, থালা বাসন, বিছানা পত্তর, খাট-আলমারির যোগাড় করতে হয় না।

গ্রীকরা গপ্পেও খুব। একবার আলাপ হ'লে হয় এবং তোমার দুর্ভাগ্যবশত সে যদি ইংরেজী জানে একটু গল্প চালাবার মত তাহলে আর দেখতে হবে না। কোথায় থাকো, কোত্থেকে এসেচো, নাম কি, কি করো, কেন এসেচো, কদ্দিন থাকবে, কেমন লাগচে, কবে ফিরবে, কে-কে আছে, তাদের কি ব্যবস্থা ক'রে এলে, কত মাইনে পাও, মাসে কত খরচ, কত জমাতে পারো, শেষপর্যন্ত—তোমাদের প্রধান মন্ত্রী কত পান, তোমাদের দিন-মজুর কত পায়—এমন কি হঠাৎ জিগ্যেস করে বসতে পারে, বিয়েতে কি পেয়েচো? তারপর সব শুনে হয়তো বলবে, ও তুমি তো কলকাতায় থাকো? তাহ'লে বম্বেতে আমার ভাইপোকে চিনবে হয়তো। তার নাম হচ্চে আণ্টাশিয়োস পাপাডোপোলস্। ঠিকানাও বলবে একটা। তখন কি মনে হবে?

মনে হবে, কী পাপই না করেচি তোমার সঙ্গে ভাব ক'রে, এখন পালাতে পারলে বাঁচি যে শ্রীযুত পাপাডোপোলস্।

When Greek meets a Greek—সেযুগে হয়তো ভীষণ কিছু ঘটতো, তবে এযুগে এমন কিছু ঘটে না। কিন্তু When a Greek meets a Foreigner এযুগে, সে বিদেশীর প্রাণ প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয় নির্ঘাৎ। আমার ভাগ্যেও ঘটেছিল এ বিড়ম্বনা একাধিকবার। তবে গ্রীক চরিত্রে এটি সর্বজনীন বিশেষত্ব নয়। আর একদিকও আছে। আতিথেয়তা। এ বিষয়ে সহুরে গ্রীকরা আর সব দেশেরই সহুরে লোকদের মত নির্লিপ্ত। কিন্তু গ্রামীন গ্রীকরা আমাদের দেশের গ্রামবাসীদের মতই অতিথি পেলে হাতে যেন স্বর্গ পায়। গ্রামে কোন বিদেশীর বিপদে পড়বার ভয় নেই। শোবার বিছানা আর ক্ষিদেয় খাবায় পাবেই—যদি মুখ ফুটে জানায় কোন গ্রামীন গ্রীককে।

সহজ, সরল গ্রামীন গ্রীকরা লেখাপড়ার ধার ধারে না বড়। চাষবাস করে, খায় দায়, গ্রামের কফিখানায় বসে আড্ডা জমায়। ছেলেরা বা মেয়েরা চাষের ফল ফসল খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে, নিজে চেপে কাছাকাছি হাটে বা বাজারে যায় বিক্রী করতে। আজকাল গ্রামে স্কুল হয়েচে, চাষীদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পড়তে শুরু করেচে গ্রীক বর্ণপরিচয়! তবে সহরের লেখাপড়ার ব্যবস্থা আছে ভালই : স্কুল আছে, কলেজ আছে এথেন্সের বিশ্ববিদ্যালয়ও দেখলাম, এক বিরাট অট্টালিকা। শুনলাম, ছেলেদের চাইতে গ্রীক মেয়েরাই বেশি শিক্ষিতা। অবশ্য, এথেন্সের হাট-বাজারে, দোকান-পাটে মেয়েদের কার্যকারিতা দেখলে একথা অবিশ্বাস করবার কারণ নেই।

কিন্তু আশ্চর্য, গ্রীসের প্রাচীন স্বর্গযুগে অস্ত্রবিদ্যায়, দর্শনশাস্ত্রে, সাহিত্যে শিল্পকলায় যেমন পাণ্ডিত্য দেখা গেছলো, আধুনিক গ্রীসে

সেসব 'এক যে ছিল রাজা'র' গল্পে ঠেকেচে। বহুদিন হ'য়ে গেল, গ্রীস আজও নামকরা কোন শিল্পী, সাহিত্যিক বা দার্শনিককে আধুনিক জগৎসভায় পাঠাতে পারলো না—যাকে জগৎবাসী সাদরে বিজয়মাল্য পরাতে পারে। আলেকজাণ্ডার, সক্রেটিস, প্লুটো সফোক্লিসের দেশে এ যেন সত্যিই দুর্ভিক্ষ! গ্রীসের বর্তমান শ্রেষ্ঠ কবি কাবাফেস এর নাম ক'জনই বা জানে আর ক'জনই বা জানে আধুনিক কথাশিল্পী ড্রাগোওমেস-এর নাম। ড্রাগোওমেস কিছুদিন আগে রাজনৈতিক আবর্তনে প'ড়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ায় গ্রীক সাহিত্যের স্রোতে বাধা প'ড়েচে ব'লেই মনে হয়। অথচ একদা এই গ্রীক ভাষাতেই প্রথম রচিত হ'য়েছিল খ্রীষ্টান ধর্মপুস্তক বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট। হোমার রচনা করেছিলেন, ওডিসিউস্, ইলিয়াড!

রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ডিনিজেসেস-এর নাম করতেই হয়। তুর্কী প্রভাব থেকে গ্রীসকে মুক্ত করবার প্রচেষ্টায় তাঁর দান গ্রীক মাত্রেই সশ্রদ্ধায় স্বীকার করে। এযুগে মেটাক্সাস-এর নামও রাজনীতি মহলে অপরিচিত নয়।

ইতিহাসে পড়েচি ম্যারাথন যুদ্ধের কথা। আজ এথেন্সে এসে এবং কাছেই ম্যারাথন যুদ্ধক্ষেত্র—খবরটা পেয়ে মনটা কেন যেন উন্মুখ হ'য়ে উঠলো সেই ইতিহাসখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে।

খবর নিয়ে জানলাম, কনষ্টিটিউসন স্কোয়ারের কাছ থেকে বাস ছাড়ে। যেতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। তবে জায়গাটা ঠিক জানা নেই। তা হোক। বিদেশ বেড়াতে বেরিয়েচি, চিত্ত ভাবনাহীন। সংসারের শৃঙ্খল কেটে ভবঘুরে। ভোজনং যত্রতত্র, অর্থাৎ যে কোন রেষ্টুরেণ্টে এবং শয়নং হট্টমন্দিরে, মানে যে কোন হোটেলে। অতএব ভাবনা কিসের? বেলা ন'টা নাগাদ চেপে বসলাম ম্যারাথন যাবার বাসে।

এথেন্সের সহরে বাসগুলি দেখতে শুনতে ভদ্র। কিন্তু মফঃস্বলের বাসগুলির অবস্থা আমাদেরই হাওড়া, মেটেবুরুজের বাসের মতোই। জানালার সার্সি আর গাড়ির ঝর্‌ঝরে আওয়াজে ইঞ্জিনের শব্দ চাপা পড়ে আর সেই সঙ্গে হর্ণের আর্তনাদ—প্যাঁক্ প্যাঁক্।

বাসখানায় বেশ ভিড়। গ্রীক চেহারাগুলিও তো কম নয়। সীটে পাশাপাশি দু'জনে বসা দায়, ধারের জনের খানিকটা ঝুলতে থাকে। মেয়েরাও বাসে ভিড় করেচে বেশ।

বাস চললো। ১৭৫ ড্রাকমা অর্থাৎ আমাদের প্রায় দশ আনা দিয়ে একখানা টিকিট কেনা গেল। সহর ছেড়ে রোদ্দুরে পোড়া মাঠের মাঝখান দিয়ে কালো পিচের ফিতের মত সরু পথ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলতে লাগলো বাস।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমাদের বাস এসে ঠেকলো ম্যারাথন গ্রামে। ছোট্ট গ্রামখানি। শ' দুই পরিবারের বাস। যথারীতি রেষ্টুরেন্ট, মাংসের দোকান, ফলের দোকান, সেলুন ইত্যাদি আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় এগুলির বিশেষ প্রয়োজন।

বাস থামতেই যাত্রীরা যে যার মত চলে গেল। তারা তো আর ম্যারাথন যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে যাবে না! তবে অনেকে দেখেচে কিনা সন্দেহ। পাড়ার শিবমন্দিরে ক'জন যায়, তারা যায় খরচ ক'রে কষ্ট ক'রে কেদারবদরী দেখতে।

একটি দোকানে গিয়ে চীনে-ইংরিজীতে ম্যারাথনের পথের কথা জিগ্যেস করলাম। ভাগ্য ভালো, লোকটা আমার কথা বুঝলো এবং ভাঙা ইংরিজীতে বললো, গ্রামটার নাম বটে ম্যারাথন, কিন্তু যুদ্ধ-ক্ষেত্রটা এখান থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে। তাছাড়া কোন যান-বাহনও নেই। পয়দলে পথ দলে চলতে হবে।

তখন বেলা সাড়ে দশটা হবে। সূর্যের কড়া রোদ। সামনে পীচ গলা পথ। পথ-নির্দেশ জানবার জন্যে পথে লোক পাওয়া দায়।

কাজেই লোকটিকে বলে একটি ছোকরা গাইড ঠিক করলাম। দক্ষিণা ঠিক হলো মাত্র তিনশো ড্রাকমা, অর্থাৎ পাঁচসিকে পয়সা। আশ্চর্য হলাম। এই রোদ্দুরে আসা-যাওয়া করে ভাজা-ভাজা হবার জন্যে মজুরি মাত্র পাঁচসিকে। দারিদ্র্যের দিক দিয়ে এই দেশটার সঙ্গে আমাদের দেশের বেশ মিল।

যাত্রা হলো শুরু। মিনিট দশেক হাঁটবার পর মনে হলো গরম দেশের লোক হলেও এই গ্রীক রোদ্দুরে আমার পক্ষে পথ চলা দুঃসাধ্য। ছেলেটি দিব্যি আমার সঙ্গে চলতে লাগলো আর গ্রীক ভাষায় বকর বকর ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করলো অনেক কিছু। আমিও ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে চললাম। ছেলেটা হয়তো ভাবলো, তার মাতৃভাষায় এই বিদেশী পোক্তই। কাজেই উৎসাহ তার বেড়ে গেল, বেড়ে গেল বকর বকর।

খানিক দূর এসে একটি ছোট চটি বা আস্তানা পেলাম। কয়েক ঘরের বাস সেখানে। আশে পাশে বাগান। আঙুরের ক্ষেত। একটা বড় গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়ে ছোকরা গাইডকেও থামালাম। ইসারায় বললাম, আর পাদমেকং ন গচ্ছামি!

আমার হাত ধরে টানলো সে, না, চলো।

না। পা দিয়ে মাটি চেপে রইলাম।

যাবে না?

না। এই নাও তোমার টাকা। তিনশো ড্রাকমার একগাদা খুচরো নোট তাকে গুণে দিয়ে বললাম, গুডবাই।

সে হাঁ ক'রে আমার দিকে চাইতে চাইতে চলে গেল। হয়তো ভাবলে, অদ্ভুত তো এই বিদেশী।

আমি গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইলাম। চমৎকার হাওয়া। ভাবচি আবার ফিরে যাই ম্যারাথন গ্রামে। সেখান থেকে বাসে করে ফিরে

যাই এখেনে। কী হবে ম্যারাথন দেখে? Yarrow unvisited-ই থাক। বরং যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে হয়তো এবার দেশে গিয়ে পলাশী বেড়িয়ে আসবো, দেখে আসবো আমাদের কলংকে কালো যুদ্ধক্ষেত্র, আমাদের পাপ, আমাদের অভিশাপের মাটি।

ভাবচি, এমন সময় দেখি দু'তিনটি ছেলেমেয়ে আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো। গ্রামেরই ছেলেমেয়ে। আমার মত বাদামী রংয়ের লোক, ওখানে দেখবার জিনিসই বটে। তার উপর কাঁধে ক্যামেরা ঝোলোনো। আমার ক্যামেরা দেখিয়ে ইসারায় বললো, ছবি তোলো। দু'জন তো পুলকের আবেগে রাস্তার পাশে ল্যাম্প-পোষ্টটা বেয়ে প্রায় ৪।৫ হাত ওপরে উঠে বললো, তোলো ছবি। এমন কষ্টকর একটি পোজ-কে সম্মান না দিলে সত্যিই ছেলে দুটি মনে কষ্ট পাবে। কাজেই ক্যামেরা বাগিয়ে তুললাম ছবি। ক্যামেরার 'টিক' আওয়াজ পেয়েই টক করে নেমে প'ড়ে আনন্দে জড়িয়ে ধরলো আমায়! তাদের দেখাদেখি মেয়েটিও। বিদেশীকে ছোটরা রং দেখে বিচার করে না, মন দেখে বিচার করে।

আমি তখন তাদের দলের হয়ে গেছি। অতএব স্বাগতম্। আমার হাত ধরে টানলো। চলো আমাদের গ্রাম ঘুরিয়ে আনি। গেলাম সঙ্গে। যুদ্ধক্ষেত্র দেখা হলো না, শান্তির গ্রাম দেখা যাক বরং।

ছোট্ট গ্রামটি। বেশ কয়েকখানি বাড়ি। মাটির দেওয়াল খোলার চাল। সামনে ফুলের বাগান, ফলের বাগান। পুরুষেরা বোধহয় কাজে বেরিয়েচে, তাই গ্রামের গলিতে ছোটদের হুড়োহুড়ি আর মেয়েদের চলাচল। বাড়ির সামনে কেউ টুলে বসে জামা সেলাই করচে, কেউ ছোট মেয়ের চুল আঁচড়ে দিচ্চে, কেউবা ব্যস্ত আঙুর শুকিয়ে কিসমিস্ মনক্কা করতে। আমার উপস্থিতিতে তাদের কাজে বাধা পড়লো হয়তো। দেখতে পেলো তারা পৃথিবীর

একটি নতুন লোককে। তারা অনেক কিছুই দেখেচে। এই তো কয়েক বছর আগে তারা তাদের আকাশে দেখেচে ডেষ্ট্রয়ার, সহরে গ্রামে দেখেচে ট্যাঙ্ক, এন্টিএয়ারক্রাফ্ট। দেখেচে মৃত্যু, দেখেচে বীভৎসতা, দেখেচে হানাহানি। পেয়েচে কি, জানিনে, তবে হারিয়েচে অনেক কিছুই।

আর সেদিন দেখলো একটি শ্যামল লোককে। কোন দেশের কে জানে!

ছেলেমেয়েদের খালি পা, ময়লা জামা, ছোট করে চুল ছাঁটা। মেয়েদের পরণে রঙীন পোষাক, মোটা ছিটের তৈরি। মাথার চুলগুলি রুক্ষ। তবে মুখখানি ক্ষেতের আঙুরের মতই রসালো, মিষ্টি। রুজ-লিপষ্টিক সে স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারেনি। বনের হরিণীর সৌন্দর্যই আলাদা, পোষা কুকুরদের মত ডগ-সোপ মেখে রূপ বাড়াতে হয় না।

গ্রাম দেখে বেরিয়ে আসছিলাম বাইরে, এমন সময় দেখি একটি তরুণী খচ্চরের পিঠে চড়ে গ্রাম থেকে বেরুচ্চে। পিঠে বোঝাই আঙুর, লতাপাতা সমেত। ক্ষেত থেকে টাটকা তোলা। কালো রংয়ের আঙুর — রস টসটসে! আঙুরউলীও তার আঙুরের মতই টসটসে—অথচ রোদ্দুরের তাপে শুকিয়ে যাবার ভয় নেই হয়তো—তাই এই রোদ্দুরেও বেরিয়েচে ক্ষেতের আঙুর বাজারে বেচতে।

তাকে দেখেই আমার ছোট্ট বন্ধুরা ছুটে গেল তার কাছে। গ্রীক ভাষায় কি যেন বললো। হয়তো বললো, দিদি দিদি, ছ্যাখো ছ্যাখো, কী রকম অদ্ভুত ধরণের একটা লোক। ঠিক তোমার ঐ কালো আঙুরের মতই। ও আমাদের বন্ধু।

বলেই তারা ছুটে এসে আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে মেয়েটির সামনে দাঁড় করালো। আমি সুযোগ পেলাম। ইশারায় মেয়েটিকে ঐভাবে খচ্চরের ওপর বসে থাকতে বললাম এবং ক্যামেরা দেখিয়ে

বললাম, তোমার ছবি তুলতে চাই।

আমার প্রস্তাবে তরুণীর মুখে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠলো। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। ঘাঘরা ব্লাউস, মাথার চুল সামান্য ঠিকঠাক করে রেডি হয়ে বসলো, নাও তোলো ছবি।

টিক! ক্যামেরার শব্দ হলো। টিক!—আর একখানা ছবি তুললাম ঐ তরুণীকে মাঝখানে রেখে ছোটদের। আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলো তারা। এই বোধহয় তাদের জীবনে প্রথম ছবি তোলা। এক দূর বিদেশীর কাছে প্রথম স্বীকার।

টাটকা তোলা টসটসে আঙুর দেখে লোভ হচ্ছিলো। পকেট থেকে ড্রাকমা নোট বার ক'রে ইশারায় বললাম, আঙুর দাও, কত দাম?

তরুণী তক্ষুনি খচ্চর থেকে নেমে বাঁধা বোঝা থেকে একগোছা লতাপাতা সমেত আঙুর বার ক'রে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে হেসে বললো যেন, নাও।

দিতে গেলাম ড্রাকমা নোটখানা, কিন্তু আশ্চর্য, আমার হাতখানা ঠেলে দিলো: না, না, আমি পয়সা চাইনে। তোমায় খেতে দিলাম বিদেশী।

আমি তো অবাক!

একটি ছোট ছেলে আমার নোটশুদ্ধ হাতখানা ধ'রে আমার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিলো: নাও, রাখো তোমার পয়সা।

সকলের ভাবখানা: বারে, তুমি আমাদের ফটো তুললে, আর আমরা তোমার কাছে আঙুরের দাম নেবো? বারে ভদ্রলোক!

গ্রীক তরুণী ততক্ষণে ছোট্ট একটি লাফ মেরে তার খচ্চরের পিঠে উঠে বসেচে। আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে, খচ্চরের মুখের লাগাম টানলো তরুণী: চললাম বিদেশী, বিদায়।

আমার ছোট্ট বন্ধুদের মধ্যে আঙুর কয়েকটি বিতরণ ক'রে দু' একটা মুখে পুরচি আর হাপুস নয়নে চেয়ে আছি বাসের দিকে। এথেন্স যাবার বাস পেলেই উঠে বসবো। কিন্তু বাসের দেখা নেই।

কাজেই গ্রামের আশেপাশে এক চক্কর দিলাম। ছেলেগুলোও আমার সঙ্গ নিলো।

দেখলাম, বুড়ি ঠাকুমা-দিদিমারা বাইরে চৌকিতে বসে কার্পেট বুনচে, বা জামা সেলাই করচে। গিন্নীরা আঙুর শুকোচ্চে, গ্রীক-বধূরা টিউবওয়েলে ভিড় করেচে জল নিতে।

দু'একজন পাইপ-ফোঁকা বৃদ্ধ ছাড়া পুরুষ তেমন চোখে না পড়ায় —এমত জায়গা বিদেশী কেন যে কোন পুরুষের পক্ষেই বিপদজনক ভেবে আমি আমার বালখিল্যদের নিয়ে আবার এসে দাঁড়ালাম বাস-ষ্টপে।

একটু পরেই দেখি গ্রামের মধ্যে থেকে বেরুচ্চে একজন গ্রীক-যুবক। মাঝারি চেহারা। সার্ট-প্যান্ট পরা। চুলগুলো কোঁকড়া। গায়ের রং মেটে।

যুবকটি আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। ছেলেগুলি যেন কি সব তাকে বললো, আমার হাতের আঙুরগুলোও দেখালো তারা।

সর্বনাশ! ভয় হলো। হয়তো বলচে, লোকটা অমুক দিদির ছবি তুলেচে, আর অমুক দিদি সেই জন্যে ওকে আঙুর খেতে দিয়েচে। বেশ রীতিমত ঘোরালো ব্যাপার। আলেকজাণ্ডারের বংশধরের হাতের গ্রীক ঘুঁসি নিশ্চয়ই ঐ আঙুরের মত নয়।

না, যুবকটি হাসলো। আমার হাতের আঙুর দেখিয়ে ভাঙা ইংরেজীতে বললো, কেমন, মিষ্টি খেতে?

বললাম, হ্যাঁ।...সত্যিই মিষ্টি আঙুরগুলো। অবশ্য না পেলে হয়তো কথামালার শৃগালের মত বলতাম, না, টক।

দু'জনের পরিচয় হলো। জন সারাণ্ডো বললো, তোমাদের

দেশের কথা শুনেচি, আজ তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারি খুশি হ'লাম।

আমার আগমনের উদ্দেশ্য শুনে বললো, এখন এথেন্স যাবার বাস কোথায়? সেই বেলা ছুটোয়। বরং ম্যরাথনটা দেখে যাও।

বললাম, এই রোদ্দুরে? দরকার নেই দেখবার।

তা কি হয়? এলে এত কষ্ট করে? দাঁড়াও এখানে। যদি কোন লরী পাই, তাতে চড়ে দু'জনে যাবো'খন।

আচ্ছা।

তা ছাড়া উপায় কি? পড়েচি গ্রীকের হাতে, ম্যারাথনে হবে যেতে। সে যুগের সৈনিকও বোধ হয় ম্যারাথন যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে মনে মনে আমার মত এতটা আশংকা প্রকাশ করেনি।

একটু পরে ভাগ্যক্রমে জুটেও গেল একটি খালি লরী। সারাণ্ডো হাত দেখিয়ে থামিয়ে কী যেন বললো। পরে পেছনের চাকার ওপর দিয়ে উঠে আমাকে বললো, ধরো আমার হাত। আমিও ছোট বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে চাকার ওপর উঠে তার হাতে ঝুলে, উঠে পড়লাম লরীতে। লরী চলতে শুরু করলো।

ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে পীচ দেওয়া পথে খালি লরী লাফাতে লাফাতে চললো। মাথার ওপর কাঠফাটা রোদ্দুর। দু'ধারে আঙুরের ক্ষেত। কালো রসালো আঙুরগুলো যেন তৃষ্ণা বাড়িয়ে দিচ্চে। দূরে পাহাড় আর পাহাড়। গ্রীসের শুকনো মাটি, গ্রামের পথ আমার সবুজ-দেখা-চোখে কেমন যেন রুক্ষ-ধূসর দেখালো। আমাদের বাংলা দেশের গ্রামের পচা ডোবা, শ্যাওলা ভরা পুকুর, ঘড়া কাঁখে বৌ, পাঁজরা দেখানো গরু, লোম ওঠা কুকুর, কলাগাছের ঝাড় আর আম কাঁঠালের গাছ,—তার সঙ্গে এই গ্রীক গ্রামের কোন মিল নেই।

ফটাস!

লরী গেল থেমে। কী ব্যাপার? লরীর টায়ার ফেটে গেচে। নাও, হলো তো!

লরী থেকে নামলাম দু'জনেই।

সারাঙো বললো, এসো ঐ গাছতলায় দাঁড়াই। অন্য লরী ধরতে হবে। বেশি দূর নয় ম্যারাথন।

সারাঙোর কাছে যখন সারেণ্ডার করেচি তখন আপত্তি করে লাভ নেই। দু'জনে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

খানিক পরেই দূরে দেখা গেল, আর একটা মাল বোঝাই লরী আসচে। কাছে আসতেই সারাঙো ড্রাইভারকে কী যেন বললো। ড্রাইভারের পাশে দু'জন লোক ব'সে। কাজেই কোথাও জায়গা নেই। ড্রাইভার তার পাশের পাদানিটা দেখিয়ে ইশারায় বললো, উঠে পড়ো।

যথা আজ্ঞা।—উঠে দাঁড়ালাম ফুটবোর্ডে।

সারাঙো ওপাশের পাদানীতে গিয়ে দাঁড়ালো।

চললো লরী। আমি প্রাণপণে লরীর জানালাটা আঁকড়ে ধ'রে রাখলাম। হায়, তবু ম্যারাথন দেখতে হবে! আমার ইচ্ছে নয়, সারাঙোর ইচ্ছে। বিদেশীকে সে তাদের ম্যারাথন যুদ্ধক্ষেত্র দেখাবেই।

শেষপর্যন্ত পৌঁছুলাম ম্যারাথনে। লরী থামালাম। আমরা দু'জনেই নামলাম। সারাঙোকে বললাম, লরীওয়ালাকে কিছু বকশিস দেওয়া দরকার, নয় কি?

না। সারাঙো হাসলো, এখানে তোমাকে নিয়ে আসা ওরও কর্তব্য।

হায়! এই ধরণের কর্তব্যজ্ঞানটুকু যদি আমাদের থাকতো! তাহলে কবি-কল্পনার সোনার ভারত সত্যিই বাস্তব সোনার ভারত হতো।

সামনেই একটা ছোট্ট দোকান।

কুয়ো থেকে জল তুলে চোখে মুখে দিলাম। দোকানীর একটা আটা ভাঙা কলও আছে। সবুজ পাতা দিয়ে ঘরখানি সাজানো। সপরিবারে দোকানী থাকে। আমরা টেবিলে ব'সে পেপসিকোলা (কোকাকোলা জাতীয়) খেলাম দু' বোতল। না, আমাকে দাম দিতে হলো না, দিলো সারাগো। আমি যে তার অতিথি!

দোকানীকে সপরিবারে একসঙ্গে বসিয়ে ফটো তুললাম। আনন্দে গ'লে গেল তারা। কিন্তু ভারি দুঃখ, সারাগো মারফত কথা বলেই তাদের খুশি থাকতে হলো।

কাছেই ম্যারাথন যুদ্ধক্ষেত্রের স্মৃতিস্তম্ভ। বিরাট মাঠের মাঝখানে উঁচু টিপি। সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম ওপরে। চারিদিক বিস্তীর্ণ মাঠ। এই মাঠই একদা রক্তাক্ত হয়েছিলো। শুকনো মাটি শুষে নিয়েছিলো দেশভক্তদের রক্ত, শত্রুদের রক্ত। দেশভক্তদের সেই রক্ত দেওয়া সার্থক হয়েছিলো, তাই গ্রীস আজও স্বাধীন। আবার সমৃদ্ধির পথে। আর, সেই রক্তশোষা মাটি বুঝি উর্বরা হয়ে সবুজ হয়ে গেচে। সেই লাল হয়ে গেচে উর্বর সবুজ। আঙুরের ক্ষেত আর ক্ষেত। ফলে আছে কালো কালো আঙুর। দেশের শত্রুদের রক্ত জমে কালো আঙুর ফলেচে নাকি?

ফেরবার পথে সারাগোর সঙ্গে আরো খানিকটা গিয়ে একটা ছোট গ্রামে এলাম। এখান থেকেই নিয়মিত বাস যায় এথেন্সে। আমি ভুল বাসে উঠে ম্যারাথন গেছলাম। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হ'লে এই গ্রামটাতেই আসা দরকার।

ভারাক্রান্ত মনে সারাগো আমার কাছে বিদায় নিলো। আমিও। তার ঠিকানা আমার ঠিকানা বদলাবদলি করলাম। হে বন্ধু বিদায়!

এথেন্সের বাসে ঝাঁকুনি খেতে খেতে ভাবছিলাম, ম্যারাথন

যুদ্ধক্ষেত্রে যেন জোর ক'রেই যেতে হলো। কিন্তু কেন? পূর্বজন্মে ঐ যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিলো নাকি? সৈনিক বেশে আমার পতন ও মৃত্যু হয়েছিলো কি ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে? নইলে অমন করে কোন যুদ্ধক্ষেত্র কোন বিদেশী লোককে টানে নাকি?

সন্ধ্যায় ফিরে এলাম এথেন্সে।

হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়লাম আবার। বিদেশে হোটেলটা রাত্রিবাসের জন্যে। তাছাড়া বাকি সময়টায় পথ চলাতেই আনন্দ!

রাস্তায় বেশ ভিড়। তবে কলকাতার মত ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি নেই। ট্রলি বাস আর ট্রামগুলোতে লোক বসেই যাচ্চে, বাদুড় ঝোলা হ'য়ে নয়। চওড়া ফুটপাথ, তার পাথরগুলো নড়বড়ে বা ঢকঢকে নয়। মাঝে-মাঝে গর্ত খোঁড়াও নেই—যাতে পদে-পদে খোঁড়া হবার সম্ভাবনা।

ফুটপথের কিনারায় বেশ কিছুটা অন্তর-অন্তর ছোট-ছোট ষ্টল। তার চারদিকটায় কাঁচের শো-কেশ, জিনিস সাজানো। দোকানদার বা দোকানদারনী ভেতরে বসে জিনিস বেচে, সামনের ফোকরে তার গলাটুকুই দেখা যায়। হরেকরকম জিনিস থাকে এই সব দোকানে ঃ স্থুঁচ থেকে খবরের কাগজ পর্যন্ত। তাছাড়া এই ধরণের ফুলের দোকানও কম নেই। প্রায় মোড়ে-মোড়ে ফল না হোক ফুলের দোকান। গ্রীকরা পুষ্প-পিযাসী।

এবং গ্রীকরা রীতিমত আড্ডাবাজও। তবে কোন বাড়ির সামনে রক না থাকায় আড্ডাটা মারতে হয় ফুটপাথে পাতা কোন রেস্তোরাঁর টেবিল চেয়ারে। এই জাতীয় অভ্যাসের দরুণ চওড়া ফুটপাথের খানিকটা অংশের মালিকানি-স্বত্ব রেস্তোরাঁ-কর্তা ভোগ

করেন ব'লে এথেন্সের পৌরসভায় ট্যাক্সও গুনতে হয় রীতিমত। অথচ, তার রেস্তোরাঁয় বসবার জায়গা থাকলেও এই ফুটপাথ-আড্ডার ব্যবস্থা তাকে করতেই হয়। যে কাফে বা রেস্তোরাঁর বাইরে ফুটপাথে বসবার টেবিল-চেয়ার নেই, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারই।

গরমের দিক দিয়ে এথেন্স কলকাতার চাইতে এমন কিছু কম নয়। অন্তত, ভঙ্গ-কুলীন বলা যেতে পারে। কাজেই এথেন্সে সন্ধ্যায় ঘরের মধ্যে বড় কেউ বন্ধ থাকে না। সেজেগুজে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে ফুটপাথের আড্ডায়, কাছাকাছি পার্কে কিংবা প্রেমিকা সঙ্গে থাকলে নির্জন কোন জায়গায়। তখন রেস্তোরাঁর টেবিলে-টেবিলে বীয়ার যত না বিক্রি হয় তার চাইতে বেশি বিক্রী হয় লেমনেড। বোতলের পর বোতল খালি হ'তে থাকে।

পার্কের খোলা জায়গায় ছোট বাঁধানো ষ্টেজে চলতে থাকে গান-বাজনা, কমিক-ম্যাজিক। লোকেরা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ে সেখানে। চেয়ার থাকলে জাঁকিয়ে বসে। আবার অনেকে রাস্তায় দোকানের শো-কেশের সাজানো জিনিসগুলো দেখে দেখে বেড়ায়। ফেরীওলারা আইসক্রীম, চকোলেট, বিস্কুট লজেন্স, বিক্রি করে ঠেলাগাড়িতে এবং অনেকেই ফুলের গুচ্ছ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় খদ্দেরের আশায়। চারদিকেই যেন একটা ঢিলেঢালা ভাব। যেন লাগাম খোলা ঘোড়া। দুঃখ, দারিদ্র্য — সবই আছে, তবে পথে-ঘাটে তা বিকট মূর্তি ধ'রে ভেংচি কাটে না কাউকে ; বরং একটু অলক্ষ্যেই থাকে! ভিখিরী ভিক্ষে চায়, কিন্তু আগে তার বেহালা বাজিয়ে শোনায়।

মাংসে আমার রুচি নেই, কাজেই নিরামিষ খাদ্য খুঁজে বার করতে হয়। খাবারের দোকানে মাংসের খাদ্যগুলোই আইটেম-এর

দিক দিয়ে দলপুষ্ট, কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব যে একেবারে নেই তা নয়। সহঅবস্থান-নীতিতে দু'পক্ষই যেন আস্থাবান এবং তাদের এই উদার নীতির ফলেই এই 'ঘাস-পাতা-ভোজী' যা হোক কিছু ভোজন করবার সুযোগ পেলো। ভোজনালয়ে ঢুকে চোখে পড়লো আমার 'চেনাজন'কে ঃ টমেটোর তরকারি, আলুর ঝোল—বা বেগুন ভাজা। তাছাড়া মোটা রুটি বা ভাত।

গ্রীকদের নিরামিষ রান্নার একটি বিশেষ পদ বোধহয় টমেটো-ভাতের ঘ্যাঁট। সেটির নাম জানা গেল না, তবে স্বাদটা জানতেই হ'লো পেটের তাগীদে। ৬০০০ ড্রাকমা দামের উক্ত দ্রব্য এক প্লেট নিয়ে চামচে-সহযোগে মুখে তুলে দেখি, সেটি গ্রীসীয় 'জাব' ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই আরো ৭০০০ ড্রাকমা 'দিবার অঙ্গীকারে' এক ডিশ আলুর ঝোল নিয়ে—সেই 'জাব' কোনপ্রকারে গলাধঃকরণ করা গেল! অর্থাৎ মোট হাজার তেরো ড্রাকমা, অর্থাৎ প্রায় সোয়া তিনটাকা খরচ করে পেটের 'গ্যাপ'-টা বোজানো গেল, আর সেই সঙ্গে মনকেও বোঝানো গেল, বিদেশে এসে ব্রাদার, এর চাইতে জিবের সুখ করতে গেলে কিন্তু চলবে না! চোখ আর মনকে কিছু দিতে গেলে জিবকে বঞ্চিত করতেই হবে—পর্যটন-আইনে এই কথাই বলে।

ঘুরতে ঘুরতে ন্যাশন্যাল পার্কের এক গেটের কাছে এসে দেখি, খুব আলোর বাহার। সামনে বক্স-অফিসে মেয়ে-পুরুষের লাইন। নানারকমের খাবার, আইসক্রীম, চকোলেট নিয়ে হকাররা দাঁড়িয়ে খদ্দেরের আশায়। গেটের সামনে এক বিরাট সাইনবোর্ড। লাল আর কালো কালিতে অনেক কিছুই লেখা, কিন্তু দুর্বোধ্য। গ্রীক

ভাষা। দাঁত ফোটাবার উপায় নেই। এভাষার এ-বি-সি-ডি পর্যন্ত আলাদা। নজর পড়লো টিকিটের লাইনের শেষে এক সুবেশা সুন্দরী তরুণী!

কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম সাইনবোর্ড দেখিয়েঃ হ্যাঁগা, কী হচ্ছে এখেনে?

তরুণী বললো ভাঙা ইংরেজীতে, রোমিও জুলিয়েট। থিয়েটার। দেখবে?

তা দেখতে পারি।

মেয়েটি আশ্চর্য হ'লো। বললো, যদি কিছু মনে না করো বলি, গ্রীক ভাষা জানো তুমি?

বললাম, জানিনে, তবে গপপোটা জানি। আর তুমি বুঝিয়ে দিয়ো।

তবে দাঁড়িয়ে পড়ো আমার পেছনে।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনের ভাবটাঃ দেখাই যাক না ব্যাপারটা! ব্যাপার দেখতেই তো বেরিয়েচি দেশ থেকে। আর ঘরে তো আমার জন্যে কেউ ভাত নিয়ে বসে নেই!

মেয়েটির পরামর্শ মতো এগারো হাজার ড্রাকমা, মানে তিন টাকার একখানা টিকিট কিনে ঢুকলাম পার্কের মধ্যে। সামনেই ফোয়ারা। তাতে লাল-নীল-হলদে রংয়ের আলোকসম্পাত। ফোয়ারার একপাশ দিয়ে গাছের ছায়া-ছায়া পথ—আঁকা বাঁকা চলে গেচে রঙ্গমঞ্চের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত। সেই পথের মাঝে মাঝে শ্বেত পাথরের মূর্তি, আর বসবার বেঞ্চ। খানিকটা যাবার পর থামতে হলো রঙ্গমঞ্চের প্রবেশ পথের মুখে। বহু মেয়ে পুরুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাপার কি?

মেয়েটি বললো, থিয়েটারের গেট খোলেনি এখনো। সন্ধ্যা সাতটার প্রথম অভিনয় শেষ হয়নি এখনো।

অর্থাৎ এটি দ্বিতীয় অভিনয়।

যাক, একটু পরেই গেট খুললো। প্রথম অভিনয়ের দর্শকরা অন্য পথে বুঝি বেরিয়ে গেচে। কাজেই আমরা একে একে ঢুকতেই মেয়ে-গাইডরা বসিয়ে দিলো আমাদের নিজের নিজের জায়গায়। চমৎকার ব্যবস্থা। ধাপ ধাপ উঁচু হয়ে যাওয়া সাদা রংয়ের গ্যালারি। দু'পাশে আর মাঝখানে চলাফেরার পথ। চারধার গাছ দিয়ে ঘেরা আর তারই মাঝে মাঝে সবুজ আলো। গাছের সবুজ পাতায় সবুজ আলো—মনটা যেন সবুজ হয়ে ওঠে। চারিদিক যেন স্বপ্নময়, স্বপ্নপুরী।

সামনে রঙ্গমঞ্চ। উঁচু বেদীতে নয়, মাটিতে। ড্রপ-সীনের বদলে সারি-সারি ফোয়ারা—সবগুলিতেই জলধারা সমান বেগে প্রায় দু' মানুষ উঁচুতে উঠে আবার ঝরে পড়চে। একখানা জলীয়-চাদর যেন থর-থর কাঁপচে! ফোয়ারার পাইপ-লাইনের গা ঘেঁসে আড়ালে রয়েচে ফুট-লাইটের নানা রংয়ের এক সারি বাল্‌ব। ক্ষণে ক্ষণে রংবেরংয়ের আলোর খেলা চলচে ঐ ফোয়ারাগুলির জল-ধারার সঙ্গে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

মেয়েটি বললো, বেশ সুন্দর জায়গাটা। না?

বললাম, হুঁ।

আবার বললো, বেশ ঠাণ্ডা, না?

বললাম, হুঁ।

বললো, তোমাদের গরমের দেশেও নিশ্চয়ই এইর থিয়েটার আছে? না?

এবার বলতে হলো, উঁহু!

কিন্তু কেন এই 'উঁহু'? আমাদের গরমের দেশেও তো এই বাগিচা-রঙ্গমঞ্চ বা পার্ক থিয়েটার শুরু করা যায়! লেকের খানিকটা জায়গা ঘিরে, ইডেনগার্ডেনের কোন কোণে, দেশবন্ধু পার্কের বা টালা

পার্কের এক অংশে যদি এই খোলা-থিয়েটার হয়, তবে দর্শকরা বন্ধ ঘরে বদ্ধ না হয়ে খোলা ফুরফুরে হাওয়ায় বেশ তো প্রাণ খুলে নাট্যসুধা পান করতে পারে!

একটু পরেই আশপাশের সবুজ আলোগুলো গেল নিভে। ফোয়ারার জলধারা গেল বন্ধ হ'য়ে। এবার ফ্লাড লাইটের তীব্র আলোয় রঙ্গমঞ্চ হ'লো আলোকিত। দেখলাম, রঙ্গমঞ্চের ভেতরটা বহুদূর বিস্তৃত স্বাভাবিক গাছপালায় সুসজ্জিত। নাটকের পাত্রেরা সজ্জিত হ'য়ে সেই দূর থেকে অভিনয় করতে করতে এগিয়ে এলো ফ্লাড লাইটের কাছে।

দৃশ্য শেষ হতেই ফ্লাড লাইট গেল নিভে। পরে যখন আবার আলো জ্বললো, দেখি চোখের সামনে ঘরের দৃশ্য! আর এক দৃশ্যে জুলিয়েটের বারান্দাও দেখলাম, সেখান থেকে ঝুঁকে পড়ে নীচেয় প্রেমিক রোমিও র সঙ্গে কথা বলচে।

দৃশ্য-বদলের ব্যবস্থাটা লক্ষ্য করবার মত। একটু লক্ষ্য করতেই দেখা গেল মাটিতে রঙ্গমঞ্চে ট্রাম লাইনের মত লাইন পাতা—ডাইনে-বাঁয়ে দু'ধারেই নেপথ্যে গিয়ে শেষ হয়েচে লাইন। নেপথ্যেই চাকা লাগানো ট্রলিতে ষ্টেজ সাজানো হচ্চে পরবর্তী দৃশ্য অনুযায়ী। পরে, দৃশ্য শেষ হতেই আলো নিভিয়ে অন্ধকারের সুযোগে নিঃশব্দে ভেতর থেকে এগিয়ে দিচ্চে সাজানো ট্রলি-ষ্টেজ। পথ বা উদ্যানের দৃশ্যে ট্রলি-ষ্টেজ ঠেলবার ঝামেলা নেই।

মাঝে বিরাম।

জ্বলে উঠলো আশেপাশের সবুজ আলো। মেয়েরা এলো চকোলেট বেচতে, পেপসি-কোলা বেচতে।

অভিনয়ের ভাষা বুঝলাম না, ভাব বুঝলাম। তবে মাঝে মাঝে সাহায্য করলো আমার বিদেশী বান্ধবী। যেসব জায়গা তার ভালো লাগলো, আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে পরম উৎসাহে ব্যাখ্যা

করলো সে সব জায়গা।

অভিনয় শুরু হয়েছিলো রাত দশটায়। যখন ভাঙলো, হাত-ঘড়িতে দেখলাম, বারোটা পাঁচ।

গ্রীক বলতেই আমাদেব মনে কেমন যেন একটা 'হুঁহুঁ' গোছের ভাব হয়। অন্তত ডি. এল· রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে লোহার টুপি পরা চওড়া তলোয়ার হাতে সেকেন্দার, সেলুকাসকে দেখে এবং ইংরেজী সিনেমায় ইয়া-ইয়া লম্বা-চওড়া 'হিরো'দের পুরুষালি বিক্রম দেখে-দেখে বেশির ভাগ বঙ্গ-পুঙ্গবদের মনেই গ্রীকদের ওপর বেশ একটা সভয়-সম্ভ্রম জেগে ওঠে—বুঝি নিজেদেরই অজ্ঞাতে। কিন্তু খাস গ্রীক-ভূমিতে এসে আমার সে স্বপ্ন এথেন্সের রাস্তায় আছড়ে প'ড়ে ভেঙে গেলো। আরে, বেশির ভাগ লোকই তো আমাদের মতই দোহারা চেহারার, কেউবা বেশ রোগা-পটকা। বেঁটে-বাঁটকুলও কম নেই! তবে অনেকেই ছাঁটা গোঁফের অধিকারী। বুঝিবা পৌরুষের ভাগটা কম বলেই—ঐ পুং-চিহ্নের প্রাচুর্য!

গ্রীক-পুলিশ দেখে তো রীতিমত লজ্জাই পেলাম। একটা লগবগ সিংকে তার দাদার পোষাক পরিয়ে বাবার সাদা হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে দিলে যেমন দেখায়—ঠিক তেমনি! গোপনে বলি, অনেকটা আমাদের বাঙ্গালী পুলিশের মতই। লম্বা-চওড়া যোয়ান তুর্কী পুলিশের কাছে গ্রীক পুলিশ ছেলেমানুষ, বেচারী!

এযুগের গ্রীক পুরুষরা আমাকে হতাশ করলেও গ্রীক মেয়েরা আমাকে 'পথে বসায়' নি। তাদের স্বাস্থ্য-সুন্দর চেহারা, ঢলঢলে মুখের লাবণ্য, কাজল-কালো চোখ, বাদামী চুল, গায়ের অলিভ রং—সব মিলিয়ে গ্রীক তরুণী, পুরুষের চোখে তো বটেই, অন্য দেশের মেয়েদের চোখেও অনিন্দ্যসুন্দরী। অনেকের মাথায় খোঁপা! আবার তাদের দেশের সেকালীন ফ্যাশান-অনুযায়ী অনেকেরই চুল ঘোড়ার

ল্যাজের মত, মানে 'পনি-টেল'-এর কায়দায় 'ঝুল্যমান'।

গ্রীক মেয়েরা শুধু বাইরে বাহারি নয়, কাজেকর্মেও শক্তিরূপিণী। সংসারে কল্যাণময়ী, ব্যবসায়ে অতি হিসেবি। দোকান-হাট করতেও যেমন পটু, দোকান-পাট চালাতেও তেমনি সিদ্ধহস্ত। গ্রীক-পুরুষরা সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত, কোন রকমে কিছু টাকা গিন্নীর হাতে তুলে দিতে পারলেই খালাস, দায়মুক্ত! গ্রীক-গিন্নীর তখন মাথাব্যথা।

গ্রীক তরুণ-তরুণীরা যে খুব চালিয়াৎ বা পোষাকে 'লক্কা-পায়রা' তাও নয়। ছেলেদের পোষাক বলতে সার্ট-প্যান্ট-জুতো—ব্যস। নেকটাই-টুপির বালাই নেই। মেয়েরাও সাজসজ্জায় তেমনিই সাদাসিধে। মাঝারি দামের ছিটের স্কার্ট, সাধারণ হিলতোলা জুতো আর কাঁধে ঝোলানো ভ্যানিটি ব্যাগ। তাদের ঠোঁটে-গালে লিপষ্টিক-রুজের পলেস্ত্রা খুব কমই চোখে পড়ে।

একদিন পার্থেনন দেখে এক্রোপলিস থেকে নামচি, দেখা হয়ে গেল একদল গ্রীক তরুণ-তরুণীর সঙ্গে। আমাকে দেখে তারা লুফে নিলো যেন। কিন্তু কেউই ইংরেজী জানে না! কাজেই প্রথমে ইশারায় কথাবার্তা চালাতে হলো। তবে ভাঙা ইংরেজীতে নিজের পরিচয়টা দিলাম: আই ইন্দিয়ান, কালকুত্তা!

তারপর পকেট থেকে বার করলাম, গ্রীসের গাইড বইখানা। পাতা উল্টে দরকারি গ্রীক শব্দের লিষ্টটা দেখে বললাম, গ্রীস Kalo (মানে, ভালো), তোমরাও 'কালো'।

স্বদেশের প্রশংসায় সবাই খুশিতে ভ'রে উঠলো। একটি তরুণী দুষ্টুমি ক'রে বললো, না, Kako (খারাপ)।

আমি মাথা নাড়লাম, মোটেই না।

এরকম অযাচিত প্রশংসায় তারা উচ্ছল হ'য়ে উঠলো। আনন্দে তারা আমার হাতখানা নিজেদের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে দিতে

লাগলো ঝাঁকুনি এবং প্রায় সমস্বরে শুরু করলো : ইন্দিয়া 'কালো'। আমাকে দেখিয়ে বললো, তুমিও 'কালো'।

হঠাৎ একটি তরুণ কখন যেন এক মুঠো চকোলেট তার পকেট থেকে বার ক'রে গুঁজে দিলো আমার হাতে : খাও!

মৃদু আপত্তি জানিয়ে হেসে বললাম, এফারিস্তো। ধন্যবাদ।

এফারিস্তো! এফারিস্তো!—আমার মুখে তাদের ভাষা আবার শুনে হেসে কথাটা বলতে লাগলো নিজেরাই।

একটি তরুণী দেখি হঠাৎ তার ব্রোচে লাগানো ফুলটা খুলে একগাল হেসে আমার কোটের বাটন-হোলে লাগিয়ে দিলো।

আমি হেসে আবার বললাম, এফারিস্তো।

তারপর আরো খানিকটা 'কোডে' কথাবার্তা চালিয়ে এইটুকুই বোঝালাম, আমি তোমাদের বন্ধু এবং তোমরা আমার বন্ধু।

অথচ এই সামান্য কথাটুকু বোঝাবার জন্যেই, আজকের পৃথিবীর রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের কত না ছোটাছুটি, হুড়োহুড়ি, আলোচনা, বক্তৃতা—এবং দিস্তে দিস্তে কাগজের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর!

শেষে, কথার লিষ্ট দেখে নিয়ে বললাম আমি, ফেবগো (Phevgo)—যাই এবার। এন্তিয়ো (Antio) গুডবাই।

তারাও বললো, আঁতিয়ো।

এরপর আলাপ হ'লো যে তরুণটির সঙ্গে, সেটি ভিনদেশীয়, জার্মান। জেউস (Zeus) মন্দির দেখছিলাম, এমন সময় চোখে পড়লো হাফসার্ট, জাঙিয়া-টাইপের হাফপ্যান্ট পরা, তালগাছের মত ঢ্যাঙা, লাল টকটকে রং, মুখে ফুরফুরে সোনালী দাড়ি, কাঁধে দামী ক্যামেরা, এক মূর্তিমান যৌবন। মন্দিরের শিল্প-নিদর্শন দেখতে-দেখতে কখন যেন আমরা কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম এবং আমার বঙ্গীয়-আকৃতি ও পাকা রং দেখে সেও হয়তো আমার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট

হ'য়েই পড়েছিলো। তাই দু'জন দু'জনকে দেখেই মৃদু হাসলাম এবং আত্ম-পরিচয় দিয়ে ভাব জমিয়ে ফেলতে আমাদের দেরি হ'লো না। বিশেষ ক'রে, দু'জনেই বিদেশী এবং আরো বড় কথা, ইংরেজী ভাষাটা দেখা গেল দু'জনেরই কিছু-কিছু আসে! কাজেই মনে হ'লো আমরা বুঝি স্বজাতি এবং মাতৃভাষা আমাদের ইংরেজী।

জার্মান তরুণের নাম আজ আর মনে নেই। কিন্তু নামে কিবা আসে যায়? তার চেহারা আর কথাবার্তা ভোলবার নয়। জার্মান তরুণ বললো, হের্, আপনার সঙ্গে কথা বলে বাঁচলাম। আজ ক'দিন এসেচি এথেন্সে, স্রেফ ইশারায় কাজ চালিয়েচি।

কোথায় আছো?

তার উত্তরে যা বললো ছেলেটি, তার চলতি মানে সংস্কৃত ভাষায় দাঁড়ায়ঃ ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে!

কি রকম?

বললো, পকেটে এখন আছে মাত্র পঞ্চাশ হাজার ড্রাকমা, আর কিছু খুচরো লেপটা। (সর্বনাশ! মাত্র আট টাকার মত আর কিছু গ্রীক খুচরো পয়সা। বলে কি?)...হ্যাঁ, বলতে লাগলো ছেলেটিঃ আর আছে পকেটে টিকিট আর পাশপোর্টখানা—ব্যস্।

ব্যস্ কিগো?—যেন আঁৎকে উঠলাম আমি।

বললো, আর কিসের দরকার? এথেন্সে ঠাণ্ডা নেই, কাজেই লোকের বাড়ির বারান্দায় রাত কাটিয়ে দিয়েচি আর খিদে পেলে শুকনো রুটি কিনে চিবিয়ে এক পেট জল খেয়ে নিয়েচি।—কটা গোঁফের ফাঁকে লালচে দাঁত বার ক'রে হেসে বললোঃ এমনি ক'রেই আজ মাস খানেক ধ'রে ঘুরচি এবং এখনো দেশে ফিরতে দিন পনেরো বাকি!

আমি বললাম হেসেঃ হে আদর্শ টুরিষ্ট, তোমাকে নমস্কার!

টুরিষ্টের উচিত হয়তো এমনি ক'রেই কোন দেশের জল হাওয়া

মাটির সঙ্গে এক হ'য়ে যাওয়া। এমনি ক'রেই প্রায় খালি পকেটে মনের থলি ভরানো। এতে দেহের কষ্ট আছে, কিন্তু মনের আনন্দ বুঝি আঠেরো আনা!

কিন্তু তেমন টুরিষ্ট ক'জন? লোকে তীর্থ করতে বা দেশ দেখতে বেরোয় ট্যাঁকে টাকার গেঁজে বেঁধে কিংবা পকেটে ট্রাভলার্স চেক নিয়ে। হুট ক'রে কেউ এক কাপড়ে বেরুতে পারে নাকি? আর বিদেশ-বিভুঁয়ে না খেয়ে মরবার ভয় কার না থাকে! কাজেই সংসারী টুরিষ্টকে সব গুছিয়ে-গাছিয়ে বাক্স-প্যাঁটরা, পোঁটলা-পুঁটলি, টাকা-পয়সা বেঁধে-ছেঁদে তবেই 'দুগগা' ব'লে বেরুতে হয়।

আবার একদল নামকা-ওয়াস্তে টুরিষ্ট আছেন, যাঁরা সঙ্গে কিছুই নেন না—ভেতরের পকেটে মোটা অংকের টাকা ছাড়া। এঁরা হাওয়াই জাহাজে পাঁচদিনে পৃথিবীর পাঁচটা মহাদেশই উড়ে ঘুরে এসে বলেন, দেশ দেখে এলাম। এঁরা এয়ার পোর্টে নেমে সেখান থেকে এয়ার-সার্ভিসের বাসে সিটি দেখতে দেখতে যান এয়ার কোম্পানীর সিটি অফিসে বা সেই সিটির কোন লাক্সারি হোটেলে এবং পরদিনই আবার সিটি দেখা শেষ ক'রে চড়ে বসেন আর একখানা প্লেনের রিজার্ভড্ সীটে। এঁরা সবদেশেই খান প্রায় একই রকমের খানা, দেখেন প্রায় একই রকমের রাস্তাঘাট এবং বাড়ি গাড়ি লোকজন। এঁরা বুড়ি-ছোঁয়া টুরিষ্ট।

দেশে দেশে মোর ঘর আছে কিংবা বসুধৈবকুটুম্বকম ভেবে নিয়ে ভবঘুরে হ'য়ে দেশভ্রমণ করবার মত বুকের পাটা অন্তত আমার নেই, আবার ঐ বুড়ি-ছোঁয়া টুরিষ্টদের মত টাকার জোরও নেই আমার! কাজেই আমি মধ্যপন্থী, সংসারী টুরিষ্ট। যতটা টাকার থলি থেকে খরচ করি, ঠিক ততটাই (বেশি হ'লে ভালোই) মনের থলিতে ভ'রে নিই। দেহকে কষ্ট না দিয়ে মনকে খুশি রাখা: জল না ছুঁয়ে মাছ ধরবার ফিকির!

এমনতর ধরি মাছ, না-ছুঁইপানির হরেকরকম ব্যবস্থা আছে এথেন্স সহরে। এথেন্স কেন, সব দেশেরই বড় বড় সহরে আছে। কাঁচে ঘেরা চমৎকার বাসে চাপিয়ে সঙ্গে গাইড দিয়ে আশে-পাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখিয়ে দেওয়া। এথেন্সে ৩০নং অমিরোতে ন্যাশনাল টুরিষ্ট অর্গানিজেসন অব গ্রীসের অফিসে গিয়ে ১৬০,০০০ ড্রাকমা দিয়ে কিনলাম একখানা কণ্ডাকটেড টুরের টিকিট: এথেন্স থেকে ডাফনে (Daphne) ইউলেসিস (Eulesis) করিন্থ (Korinth) হ'য়ে সিলকাস্ট্রন (Xylokastron) এর সমুদ্রতীরে এবং দিনের শেষে ফের ফিরে আসা। দুপুরের লাঞ্চ ঐ খরচার মধ্যেই।

সকাল আটটায় সেজেগুজে বেরুনো গেল। বাসে উঠে দেখি আগেভাগে ছুটি অনেকে বসিয়া আছে 'বাস' 'পরে উঠি, নিশ্চিন্ত নীরবে। দু'টি ফরাসী তরুণীর পাশের সিটটা দেখা গেল আমার! এটা হয়তো ঈর্ষার বস্তু হ'তে পারে যে কোন পুরুষের কাছে, কিন্তু চিন্তার ব্যাপারও কম নয়। অতটা পথ, পাশের মেয়ের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে বসে থাকা—পাপেরই শাস্তি! বরং পাশে পুরুষ কেউ থাকলে বাসের ঝাঁকুনিতে তার গায়ে ঢ'লে পড়তে বাধা ছিল না! তবে তখনও বুঝিনি, এসব চিন্তাধারা আমার প্রাচ্যমন-প্রসূত মাত্র। এবং আমার চলা-ফেরা তখনও পর্যন্ত পশ্চিমী ইয়োরোপের আশেপাশেই সীমাবদ্ধ থাকায় তদ্দেশীয় চালচলন আদব-কায়দা ঠিক ধাতস্থ হয়নি। তবে হ্যাঁ গ্রীসে এসে সবেমাত্র আমার মন আর চোখ ধাক্কা খেতে শুরু করেচে। ষ্টেডিয়ামের সামনের চওড়া রাস্তা হিয়োধো এট্রিকোর পাশে প্রকাশ্য দিবালোকে একদিন দু'টি তরুণ তরুণীকে গাঢ় ও দৃঢ় আলিঙ্গন অবস্থায় দেখে নিজেই হকচকিয়ে লজ্জায় স'রে পড়েছিলাম। রাত্রে পাড়ার গলিতে টলে এবং ঢলে-পড়া গ্রীক যুবক যুবতীর মত্তাবস্থায় তারস্বরে বেতালা সঙ্গীত প্রচেষ্টা দেখেও প্রাণে পেয়েছিলাম আঘাত।

যাইহোক, বাস চলতে শুরু হ'লে, ঝাঁকুনি খেয়ে পাশের তরুণীই যখন দেখা গেল, নিজেকে সামলাবার কোন চেষ্টাই করচে না, বরং বরাঙ্গনার কোমল অঙ্গের ধাক্কায় আমারই কয়েকবার সীটচ্যুত হবার উপক্রম হ'লো, তখন বিনাদ্বিধায় ভালো হ'য়ে না বসা মানে পৌরুষেরই অপমান। এবং তাতে দেখি উদারমনভাবাপন্না ফরাসী তরুণী নিজেই স'রে গিয়ে বললো, ইয়েস, বি কমফর্তেবল্!

বাসে নানাজাতির সমাবেশ। সবাই গ্রীসের পর্যটক। শুধু টুরিষ্ট বাসটির গাইড এক গ্রীক তরুণী। ছিপছিপে চেহারা। মিষ্টি হাসি। আর চমৎকার কথা বলবার ভঙ্গী। প্রথমে ফরাসী ও পরে ইংরেজী ভাষায় পথের দু'ধারের বর্ণনা দিয়ে যেতে লাগলো অনর্গল! যেন রেকর্ড বাজচে। কথায় কোথাও হোঁচট খাবার নামটি নেই।

আমার বাঁ পাশের প্যাসেজের পরের সীটে এক মধ্যবয়সী মার্কিন দম্পতি। পরিচয় হ'লো ঃ মিঃ এবং মিসেস হুভার। খানিক পরেই দেখি ভদ্রমহিলা স্বামীর কোলে ঢ'লে পড়লেন। কী হ'লো? কিন্তু 'কী হ'লো' ব'লে পরের ব্যাপারে নাক গলানো—যখন-তখন যেখানে-সেখানে চলে না। কাজেই কৌতুহল চেপে রেখে গার্ল গাইডের বিবরণই শুনতে লাগলাম। তবে দেখলাম, মার্কিন স্বামীটি গুডবয়ের মতই স্ত্রীর মাথাটা কোলে রেখে বোম্‌ভোলা হ'য়ে বসে রইলেন এবং আরো লক্ষ্য করলাম, তিনিও তাঁর বেটার-হাফকে এই ঢ'লে পড়ার কারণ জিগ্যেস করলেন না। তবে একটা সৎকার্য করতে গেলেন তিনি, কিন্তু বাধা পেলেন। মহিলার বড় গলা ব্লাউসের এক দিকটা কাঁধ থেকে ক্রমেই নেমে পড়ায় তাঁর বডিসের ষ্ট্র্যাপটা দেখা যেতে লাগলো এবং সেকারণে যে কোন সৎস্বামীর মতই এই মার্কিন স্বামীটিও ভাবলেন, স্ত্রীর লজ্জা সরম অক্ষুণ্ণ রাখবার ভার তাঁরই ওপর। এই ভেবে তিনি আলগোছে

স্ত্রীর ব্লাউসের কোণটা কাঁধের ওপর তুলে দিতে গিয়ে দেখি বাধা পেলেন। স্ত্রী বললেন, থাক, ইট ইজ টু·উ হট! এতক্ষণে বুঝলাম ভদ্রমহিলার ঢ'লে পড়ার এবং ব্লাউসটার ঝুলে পড়ার সবিশেষ কারণ।

বাস ডাফনে (Daphne)-তে পৌঁছুলো। সবাই নেমে দেখলাম ঘুরেফিরে। গার্ল-গাইড সব বুঝিয়ে দিতে লাগলো। চারিদিকে ধ্বংসাবশেষ। খ্রীষ্টীয় গীর্জা একটা আজও মহাকালের কোপদৃষ্টিতে পড়েনি বটে তবে শুনলাম সেকালীন গ্রীক শত্রু তুর্কীদের তরবারির নির্মম আঘাত সহ্য করতে হয়েছিলো রীতিমত। তবে দেখা গেল, গীর্জার দেওয়ালের গায়ে যীশুর জীবনীর ফ্রেস্কো এবং জানলার কাঁচে লরেল পাতার ডিজাইন। যেন ধর্মের জয় ঘোষণা।

আবার উঠলাম বাসে। পথে Eylesis-এ প্যালেস অব মিষ্ট্রি বা রহস্য প্রাসাদ (এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়) দেখে রওনা হ'লাম ঐতিহাসিক করিন্থ সহরের ধ্বংসাবস্থা দেখতে। সমুদ্রের ধার দিয়ে-দিয়ে চমৎকার পীচ-পালিশ রাস্তা। অদূরে ফিকে সবুজ জলে ঢেউ আর ঢেউ। আরো একটু দূরের জল গাঢ় সবুজ, আর সমুদ্রের শেষ সীমা—আকাশের সঙ্গে রেখা-বন্ধনে বাঁধা! —সেখানে জলের ঘোর নীল আর আকাশের ফিকে নীলের অপূর্ব নীলাঞ্জলি!

সমুদ্রের পাড় ছেড়ে রাস্তা চললো এঁকে বেঁকে ক্ষেতের ভেতর দিয়ে। দু'ধারে ক্ষেত, আঙুরের ক্ষেত। সবুজ পাতার ফাঁকে-ফাঁকে কালো আঙুরের গুচ্ছ। টুপি মাথায় চাষী ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত। খানিক পরে গ্রামও পড়লো চোখে। সব খোলার বাড়ি, সামনে বাগান। মাঝে মাঝে খোলা জায়গা। আধময়লা পোষাকে চাষী গিন্নীরা উঠোনে আঙুর শুকোচ্চে: বাজারে এ জিনিসের দাম আছে। কেক পুডিং-এ দরকার। বাইরেও চালান যায়।

শেষে এলাম করিন্থে। যীশু খ্রীষ্ট জন্মাবারও চার হাজার বছরের পুরোন সহর। কোরিন্থিয়ানদের সাধের নগরী। পরে রোমানরা এসে হামলে পড়েছিলো দেশটায়। তচনচ ক'রে গেছলো নগরীর সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য—! কিন্তু ঐতিহ্য বুঝি নষ্ট হয়নি আজও। তাই দূর-দূর থেকে আজও ছুটে আসে জগদ্বাসী সেই কোরিন্থিয়ানদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষটুকুও দেখতে।

এপোলোর মন্দিরের স্তম্ভগুলি আজও যেন দম্ভভরে মাথা উঁচু ক'রে বলচে, আমরা ছিলাম, আমরা আছি, আমরা থাকবো—এ অবস্থাতেও আমরা দ্রষ্টব্য এবং তাই তো তোমরা এখানে। দেখলাম, Perene-এর উৎস বা ফোয়ারা। জলের শব্দ শোনা গেল, কিন্তু সে জলের উৎস কোথায়, আজও নাকি তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। আরো দেখলাম, পাথরের পথে চাকার দাগ। এ দাগ বুঝি মন থেকেও মেলাবার নয়।

করিন্থ-এর মিউজিয়ামে সাজানো রয়েচে আজ থেকে প্রায় ছ' হাজার বছরের পুরোন 'ভাস' বা পাথরের গামলা, প্রায় দু'হাজার বছর আগেকার হাড়ের বাঁশি। তাছাড়া সেকালের কানের রিং, আর্শি, চিরুনী, টাকা-পয়সা এবং অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি। সেযুগের একটি ছেলের কংকাল আর একটা ছোট 'ভাস'ও দেখলাম, মাটির তলা থেকে পাওয়া গেচে মাত্র কুড়ি পঁচিশ দিন আগে। কংকালটাকে ভালো ক'রেই দেখলাম। মানবজাতির এক উত্তরপুরুষ দেখলো তার পূর্বপুরুষের শেষচিহ্ন।

তবে একটা জিনিস দেখে মনে আবার ধাক্কা খেলাম, ফিরিয়ে নিলাম চোখ। মেয়েদের অবস্থা হ'লো আরো সঙ্গীন। ও-ও-ও শব্দে তড়িৎ-গতিতে তাঁরা ছিটকে স'রে গেলেন সেখান থেকে। দেখি, মার্বেল পাথরে তৈরি সম্রাট অগাষ্টাসের নগ্নমূর্তিতে—একি,

স্ফীত পুরুষাঙ্গের নির্লজ্জ প্রকাশ!...হয়তো সৃষ্টির ইঙ্গিত! কিন্তু অনাসৃষ্টি, সন্দেহ নেই।

আমাদের গার্ল-গাইড বললো, এবার সিলকাষ্ট্রেন। সেখানে লাঞ্চ এবং সমুদ্রস্নান! অতএব বাসে আরো ঘণ্টানেক কাটিয়ে আমরা পেঁীছুলাম মনোরম সমুদ্রতীরে। চমৎকার বীচ। সী-সাইডে আরামপ্রদ হোটেল। আমরা ডাইনিং হলের টেবিল চেয়ারগুলো দখল ক'রে বসলাম। চোখের সামনে চললো অকূল সমুদ্রের নীল সবুজের খেলা! আর, আশ্চর্য, আমার আরো কাছে দু'জোড়া নীল চোখ ও এক জোড়া বাদামী চোখের উছল মধুর চাহুনী। মানে, ঐ দুই ফরাসী তরুণী, গার্ল-গাইড আর আমি বসলাম এক টেবিলেই।

এই ত্রি-তরুণী সঙ্গলাভের মধ্যে—আমার কোনরকম গূঢ় উদ্দেশ্যই ছিল না। বরং কারণটা যা ছিল. তা যেমনি বিস্ময়কর, তেমনিই অত্যন্ত নির্দোষের। মানে যখন গার্ল-গাইডকে বললাম, আমি মাংসাশী নই, তখন হেসে বললো সে, ইজ ইট? দেন, স্যার, ইউ আর মেণ্ট ফর দিস টেবল! এবং সেই টেবিলে দেখি ঐ দুই ফরাসী সুন্দরী এবং গার্ল-গাইড নিজেও বসলো এসে আমার সঙ্গে। বিস্ময় তখন আমার চোখে মুখে। জিগ্যেস করলাম, হে লেডিজত্রয়ি, তোমাদেরও মাংসে অরুচি নাকি? তারা ঘাড় নেড়ে হাসলো, হ্যাঁ।

অতএব একই রুচি যখন আমাদের, তখন গল্প জমানো যাক। খাবার আসুক ততক্ষণে। ফরাসী তরুণীদ্বয় নাকি কলেজের ছাত্রী, ইতিহাস তাদের বিষয়বস্তু। কলেজে হিস্ট্রি অব গ্রীস এণ্ড রোম প'ড়ে-প'ড়ে টায়ার্ড, তাই ঠিক করেচে দেশ দু'টোকে স্বচক্ষে দেখে আসবে। তাতে মনে রেখা পাত করলে, মানে মনস্থ করতে পারলে মুখস্থ করার দায় থেকে বাঁচবে তারা। তাদের ইতালী দেখা হ'য়ে গেচে,

গ্রীস বাকি।...আমি ইতালি যাবো জেনে দুই বান্ধবী অনর্গল পরামর্শ দিয়ে গেল এবং ফ্রান্সে যাবো জেনে, আমাকে নিমন্ত্রণ ——— ভুললো না। মেয়ে-দুটির কথাবার্তা ভারি মিষ্টি, কিন্তু মুখখানায় তেমন মিষ্টি ভাব দেখলাম না। প্রায়-সাদা-চুল ছেলেদের মত ছাঁটা, গালের হাড় দু'টো উঁচু, মুখখানা লম্বাটে আর গায়ের রং ধবল সাদা। তাছাড়া বগল-কাটা খাটো-টাইট পোষাকে হাড়-সর্বস্ব দেহ লতা দু'জনেরই রীতিমত প্রকট। পরে ইয়োরোপের মধ্যস্থলে গিয়ে বুঝেছিলাম, ঐ রূপ ও সজ্জাই হচ্চে পাশ্চাত্যের লক্ষ্মীশ্রী।

সে তুলনায় গার্ল-গাইড ইভা পাপায়োনোর রূপ-সজ্জা অনেকটা প্রাচ্য-ঢংয়ের। বব্‌ড করা বাদামী চুল, বাদামী চোখের তারা, গায়ের অলিভ রং, ঢলঢলে মুখশ্রী, আর যৌবন-ঢাকা পোষাকে ইভা বরং শ্রীময়ী! হয়তো এ আমার প্রাচ্যচোখের পক্ষপাতিত্ব! জানলাম, ইভা পাপায়োনো এক গ্রীক-গৃহলক্ষ্মী। শুধু তাই নয়, এক শিশুপুত্রের জননী। সংসারে অর্থের সাকুল্যের জন্যেই নাকি তার এই নির্দেশনা-বৃত্তি!

লাঞ্চ এলো। রুটি, মাখন, চীজ, বেগুন ভাজা, আলুর ঝোল, আইসক্রীম, কলা, আঙুর এবং চা। অন্য টেবিলের মেনু দেখলাম আমিষ।

এবার মুস্কিলে পড়লাম আমি। এর আগে মধ্যপ্রাচ্যের সহর-গুলো ঘুরেচি, বেড়িয়েচি, খেয়েচি নিজের ইচ্ছামত এবং নিজস্ব ভঙ্গীতে। যেমন ইচ্ছে কাঁটা-চামচ ধরেচি,—কাঁটা-চামচের এটিকেট মানতে হয়নি আর ভুল ক'রে সেসব ধরলেও আমার হাত চেপে ধরতেও যায়নি কেউ! কিন্তু এখন! এই তিন তরুণীর সামনে, বিশেষ ক'রে দু'টি বিশুদ্ধ সেণ্ট-পারসেণ্ট ইয়োরোপিয়ার নাকের সামনে ভুল ক'রে কাঁটা-চামচে ধরলে—বিশ্বাস কি, হয়তো তা দেখে

তারা অজ্ঞান হ'য়ে চেয়ার থেকে উল্টে পড়তেও পারে।

হাউয়াই জাহাজের ঐ এক দোষ! আজ তুমি বাড়িতে দিব্যি পিঁড়িতে ব'সে ঝোল-ভাত চটকে মাখিয়ে বড় বড় গরস তুলচো মুখে, আর কাল, ব্যস, একেবারে পাকা সাহেব হ'তে হবে, দেখাতে হবে যেন আতুড়ঘর থেকেই তুমি স্যুট পরচো আর কাঁটা-চামচ দু'হাতে নিয়েই জন্মেছিলে তুমি!

আমি ভেবে দেখলাম, ওদের চোখের সামনে কাঁটা-চামচের পরীক্ষা দেওয়ার চাইতে স্রেফ বলা ভালো, ও বিষয়ে ভালো 'পড়াশোনা' নেই। দেশে 'জয় মা কালি রেষ্টুরেণ্টে' কাঁটা-চামচেয় ভেজিটেবল চপ-কাটলেট খেলেও—ও দু'টির পাশ্চাত্য কায়দা-কানুন আমার অজানা! তাছাড়া মুখে স্বীকার করলে মনেও স্বস্তি পাওয়া যাবে, আর প্রাণভ'রে প্লেট সাবড়ানো যাবে খিদের মুখে। তাই হেসে নিজের ডান হাতখানা দেখিয়ে বললাম, দেখো মেয়েরা, আমরা দেশে এই ঈশ্বর-দত্ত হাত দিয়েই খাবার মুখে তুলি, কাজেই আমার এই কাঁটা-চামচে ধরায় ভুল দেখলে ভয়ে মূর্চ্ছা যেয়ো না যেন!

শুনে হেসে উঠলো তিনজনই। ইভা বললো, না না, যেমন ইচ্ছে তেমনি ক'রেই মুখ চলুক! ফরাসী তরুণীদ্বয়ের একজন বললো, নো ফরমালিতিস্ মঁসিয়ে!

অতএব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কাঁটা-চামচে ধরলাম।

লাঞ্চ সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর ক্লোকরুমে ঢুকলাম আমরা পুরুষরা। মেয়েরাও গেলেন তাঁদের সাজঘরে। একটু পরেই বেদিং কষ্টিউম প'রে বেরিয়ে এলাম আমরা, ঝাঁপিয়ে পড়লাম লোনা নীল জলে। সুইমিং কষ্টিউম প'রে ছেলেদের স্নান করতে দেখেচি হেদো কিংবা কলেজ স্কোয়ারে পুকুরে, তবে মেয়েদের এমন বেদিং কষ্টিউম পরা দেহলতা পর্দার ছায়াছবিতে দেখাই অভ্যাস, এমন একহাত দূরে রক্তে-মাংসে দেখে চোখ দু'টো আমার আচমকা

হয়তো গোলাকার হয়ে উঠেছিলো। তাড়াতাড়ি মন তার চোখ টিপে বোঝালো, এতেই এত অধীর হয়ো না বৎস, আরো অনেক কিছুই দেখতে হবে। বরং তৈরি হও!

সিলকাণ্ট্রনের সমুদ্র হঠাৎ-গভীর নয়। তাছাড়া ঢেউয়ের ধাক্কাও তত নেই। জল টলটল করছে, পরিষ্কার। তলাকার ঝিনুক নুড়িগুলোও দেখা যায়। বেশ খানিকটা গিয়ে পেলাম বুকজল। শুরু করলাম ঝাঁপাই। দেখি গা ভাসাতে ভাসাতে হঠাৎ মিসেস হুভার এলেন কাছে— সেই গরমে স্বামীর কোলে নেতিয়ে-পড়া মহিলাটি। বললেন হেসে, আঃ বাঁচলাম স্নান করে।···তুমিও তো গরম দেশের লোক, আরাম হচ্চে না, বললাম? হচ্চে বৈকি।

বললেন, এখানকার জলটা কিন্তু খুব পরিষ্কার না?

বললাম, হু, নীচেটা পর্যন্ত দেখা যাচ্চে।—দাঁড়াও। বলে হঠাৎ ডুব দিলেন ভদ্রমহিলা এবং এক মুঠো নুড়ি ঝিনুক তুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, নাও।

নিলাম। বলতেও হলো, থ্যাংকস। কিন্তু স্নান করতে এসে এমন লক্ষণের ফল ধরে থাকা যায় নাকি? তাই একটা পালিশ গোলাকার নুড়ি রেখে আর সব ফেলে দিয়ে হেসে বললাম—A valuable Suvenior presented by Mrs. Hoover from 20,000 Leagues under the Sea।

রাইট।— হেসে উঠলেন আমাদের কাছেই স্নানরত আর এক মার্কিন ভদ্রলোক।

মিসেস হুভার হেসে আমাকে বললেন, ও ইউ নটি।

আমার আশে পাশে চারিদিকেই মেয়ে পুরুষরা জল ক্রীড়ায় মত্ত। আমার সামনে এক টাক মাথা ভদ্রলোক দেখলাম গলা পর্যন্ত শরীরটা সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখেছেন। বললাম, হ্যাঁ স্যার, মাথাটা ডোবান, নইলে রক্ত যে সব মাথায় উঠে যাবে। ভদ্রলোক বললেন, ডুব দিতে ভয়

করে, যদি একেবারে ডুবে যাই ?

হঠাৎ দেখি, সমুদ্রের তীরে জলের কাছে দুটি সফরি ফরফরায়তে। গা ভাসিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি সেই দুই ফরাসী তরুণী। দুজনে এ ওর হাত ধরে অল্প জলে ঢেউয়ের সাদা ফেনার মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্চে। গা-ময় বালি। জলাতংক।

হ্যালো মাদমোয়াজেল, কী ব্যাপার ? জলে এসো !

নোও, দীপ ওয়াতার — ভিজে কাকের মত চিঁ চিঁ করে বললো ওদের মধ্যে একজন।

ইভা একটু দূরে হরদম ডুব দিচ্ছিলো, বললো, জলে যে ভয় ওদের।

এমন সময় একজন ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন তাদের দিকে ঃ দেন লেট মি ড্র্যাগ ইউ ডাউন—শুনেই দুজনের একজন জল থেকে উঠেই বালুচরে পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগলো হোটেলমুখো। আর একজন ভয়ে কাঠ হয়ে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে বসলো।

ঐ কাণ্ড দেখে আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম সবাই। ভদ্রলোকও হাসলেন। তবে থমকে গেলেন উনি।

বিকেলে ফিরলাম আমরা এথেন্সের পথে। ইভা পথে আমাদের দুটি ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য দেখালো। বাস থামিয়ে একটা গাছের কাছে নিয়ে বললো, এইখানে মহাজ্ঞানী এরিষ্টটল বসে প্রচার করতেন তাঁর অমূল্য বাণী। সেই পুরানো গাছটা মরে গেচে, তারই শেকড় থেকে গজিয়েচে এই গাছটা। দেখলাম, অতি উৎসাহীরা সে গাছের পাতা ছিঁড়তে শুরু করলো। দেখাদেখি আমিও ছিঁড়লাম কয়েকটা।

তারপর এথেন্স সহরের মধ্যেই একটা পার্কের ভেতরে ইভা আমাদের নিয়ে গেলো। দেখলাম, পার্কের এক কোণে পাথরের ঘর, লোহার গরাদ দেওয়া দরজা, দেওয়ালের মাথায় দু'তিনটে জানলা।

দরজার কাছে আসতেই নাকে এলো চামচিকের গন্ধ! দেখি কতক-গুলো চামচিকে বিরাজ করচে দেওয়ালে। কিন্তু ইভার মুখে যা শুনলাম, তাতে ঐ বদ্ধ ঘরটার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠলো মন। ইভা বললো, এই এই ঘরেই মহাপুরুষ সাক্রেটিস ছিলেন বন্দী এবং নিজ-হাতে বিষপান করেছিলেন এখানেই।

এই সেই ঘর! দেশ-কাল ও আশেপাশের পাত্র-পাত্রীদের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে জোড়হাতে প্রণাম করলাম। সেই অমরাত্মার প্রতি জানালার আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

যাত্রা শেষ হলো।

পরস্পরকে বিদায় সম্ভাষণ এবং ইভাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার পর সারাদিনের বন্ধুত্বের হলো বিচ্ছেদ!

পরদিন এথেন্সকেও বিদায় জানালাম আমি।

ঐতিহাসিক সুসভা মহানগরীকে জানালাম আমার অন্তরের শ্রদ্ধা। ভারতের সংগে এই মহান দেশটির একদিন ঘটেছিলো যোগাযোগ। আলেকজান্দার তরবারি নিয়ে ঢুকেছিলেন এই ভারতে কিন্তু ভারতীয় অতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে শেষপর্যন্ত তাকে কোষবদ্ধ করতে হয়েছিলো তরবারি। ভারত ও গ্রীক সভ্যতায় মিলন ঘটেছিলো। ভারতের হে প্রবীণ বন্ধু, বিদায়।

BEA সিটি অফিসে এলাম মালপত্র নিয়ে। Air Port-এ রোমে যাবার প্লেন আরো ঘণ্টা দুই বাদে ছাড়বে— বেলা দুটো নাগাদ। কিন্তু তার আগে মালপত্র ওজন করানো, পাসপোর্ট দেখানো ইত্যাদির ঝামেলাগুলো সারতে হবে। তারপর এয়ার কোম্পানীর বাসে এয়ার পোর্টে। সেখানেও প্লেনে ওঠবার ডাক শোনার আশায় কান পেতে বসে থাকা। অর্থাৎ এক ঘণ্টার যাত্রার জন্যে ঘণ্টা দুয়েকের পাঁয়তাড়া। কিন্তু উপায় নেই। Air traffic-এর নিয়ম।

কাজ সেরে বসে আছি বাসের জন্যে।

শেষ দেখা দেখচি এথেন্সের পথ আর পথ চলা লোকদের। এই সেই স্বপ্নের গ্রীস এথেন্স আর গ্রীকজন। এই সেই দেশ, যে দেশ মিনার্ভা, এথিনা, জেউস. এপোলো ইত্যাদি গ্রীক দেবদেবীর আশীর্বাদ-পুত, যে দেশ মহাজ্ঞানী এরিস্টটল. প্লুটো, সক্রেটিসের বাণী-ধ্বনিত, যে দেশে মহাবীর আলেকজান্দারের অভ্যুদয়, যে দেশে প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়ার জন্ম, যে দেশ ছিলো ইংরেজ কবি বায়রনের স্বপ্ন ·

শু-শাইন স্যার ?

এঁ্যা !—হঠাৎ চমকে চেয়ে দেখিঁ জুতো পালিশের বাক্স নিয়ে এক ছোকরা দাঁড়িয়ে।

শু-শাইন ?

হুঁ হুঁ।—এগিয়ে দিলাম জুতো সমেত পা। করো পালিশ। গ্রীকদের ধারণা নাকি, যার যত চকচকে জুতো, তারই 'দর' তত বেশি।